ভূমিকা

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রগণের উপযোগী একখানি বাঙ্গালা সঙ্কলন-গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্কলন গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ অভাব উহাতে পূরণ হয় না। কারণ কলিকাতার মত বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রবাসী ছাত্রগণ বাঙ্গালা পড়িতে বাধ্য নহে। সুতরাং অনেক ছাত্রের মাতৃভাষার চর্চ্চা প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়। যাহাতে তাহাদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট লেখকগণের সহিত পরিচয় ঘটে এবং মৌলিক চিন্তার অভ্যাস জন্মে তদুদ্দেশ্যে আমরা এই সঙ্কলন গ্রন্থখানিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের লেখনীপ্রসূত চিন্তামূলক ও বিশ্লেষণগর্ভ প্রবন্ধের প্রাধান্য দিয়াছি। কিন্তু তৎসঙ্গে, মনোহর, কবিত্বপূর্ণ ও উপদেশাত্মক নিবন্ধসমূহের সমাবেশ করিয়া, ইহার বৈচিত্র্য-সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কতকগুলি প্রবন্ধের এরূপ অংশ আমরা উদ্ধার করিয়াছি যে, তাহা পাঠ করিয়া ছাত্রগণের সমগ্র প্রবন্ধটি এবং লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিবার আগ্রহ স্বতঃই বর্দ্ধিত হইবে।

বলা বাহুল্য যে, প্রবাসী ছাত্রগণের জন্য এরূপ গ্রন্থসঙ্কলন ব্যবসায় হিসাবে মোটেই লাভজনক নহে। কেবল বালকগণের পাঠ-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য এবং চিন্তাশীলতার বিকাশ-সাধন জন্য যে শ্রম স্বীকার করিলাম, তদ্দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। বঙ্গের বাহিরে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যদি এই গ্রন্থের প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করেন, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

যে সকল সহৃদয় লেখক ও স্বত্বাধিকারী তাঁহাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগের এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আর যাঁহাদিগের নিকট আমরা অনুমতি লইবার সুবিধা পাই নাই, আশা করি, তাঁহারা এই গ্রন্থের সাধু উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এলাহাবাদ
মাঘ, ১৩৪৩

বিনীত—
সঙ্কলক

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সংযুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের আনুকূল্যে এই গ্রন্থখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সেইজন্য পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সংস্করণে কিছু নূতন বিষয় সংযোজিত হওয়ায় ইহার উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি।

বিনীত—
সঙ্কলক

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে আধুনিক লেখকগণের রচনা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মনোহারিত্ব বর্দ্ধিত হইল।

বিনীত—
সঙ্কলক

সূচীপত্র

সাহিত্য-সঞ্চয়ন

রামচন্দ্রের মহানুভাবতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একদিন মহর্ষি সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশন পূর্ব্বক একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণ-পত্র তদীয় হস্তে সমর্পিত করিল। মহর্ষি পত্র পাঠ করিয়া, পরম প্রীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক, এই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন, এবং শিষ্যদিগকে তাহার আহারাদির সমাধানের ভার প্রদান করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্য্য-সাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্য ভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। রামের ও উহাদের দুই সহোদরের আকৃতিগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক। আর অবলোকন মাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবে, এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রেত-সিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছেন। কল্য প্রভাতে প্রস্থান করিব, মানস করিয়াছি, আপনার শিষ্য [illegible], তোমার পুত্রদ্বয়েরও [illegible] হইবে। সীতা

তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। মহর্ষি স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া শিষ্য-দিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত তোমরা জনপদের কোন ব্যাপার অবলোকন কর নাই, রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবেক এবং তথায় অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমরা অনেক অংশে লৌকিক ব্যাপার অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক কীর্ত্তিবর্ণন পাঠ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়নগোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকিমুখে রামের নাম শ্রবণ করিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত রাম সীতাগত-প্রাণ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আর তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই রাম তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন এই ভাবিয়া তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই শোক সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোন অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন

পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সেই স্নেহের ও অনুরাগের অল্পাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুলচিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব সহসা তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা। মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞ-দর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণ-পত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকটে গিয়া রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা যারপরনাই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজা-রঞ্জনানুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেন। সে বলিল যজ্ঞসমাধানার্থে বশিষ্ঠদেব রাজাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। রামচন্দ্র প্রজাপুঞ্জ প্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা ইতিহাস গ্রন্থে অনেক অনেক রাজার ও অনেক অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, কিন্তু কেহই কোন অংশে রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সী পরিত্যাগ ও প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পড়িয়া অবধি আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিব, এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত; অতএব অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রাজদর্শনে যাই।

সীতা অনুমতি প্রদান করিলেন, তাহারা দুই সহোদরে অতিশয় হর্ষিত হইয়া মহর্ষি-সমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া যে অতি বিষম বিষাদ বিষে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল এবং নির্ব্বাসনক্ষোভ তিরোহিত হইয়া তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য-গর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

মাতৃভাষার সমাদর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাহার সূচনায় তিনি মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন উদ্ধৃত অংশটি তাহার অন্তর্গত। তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখ ছিলেন। লেখাপড়ার কথা দূরে থাক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হইত না, সমস্তই ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইত। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মাতৃভাষায় অনুরাগী করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার উদ্যম সফল হইয়াছিল।]

আমরা ইংরেজি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরেজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরেজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরেজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে,

যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরেজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত, সে সকল কথা ইংরেজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরেজির দ্বারা সাধনীয়, কেননা, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি-ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরেজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরেজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরেজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী, যদি তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরেজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না; কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কহি, বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবন-যাত্রার সুসহায়। নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরেজি লেখক, ইংরেজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরেজ ভিন্ন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপনার উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরেজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয় ? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে ? যদি কেহ এমন মনে

করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সকল বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোকেরা ইংরেজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্ ফিল্‌টার্ ডৌন* করিবে। একথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই, তাহারা কাজেকাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। * * * * * *

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণী লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা

---

* Filter down.

দূর্ব্ব দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। দূর্ব্ব দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অনেক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চশ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক্, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উন্নত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এই অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেইদিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী। এথেন্সে সকলে সমান। স্পার্টায় একজাতি প্রভু, একজাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব এথেন্স তাহার প্রসূতি। স্পার্টা তুলনায় লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ অব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও ইহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজবিপ্লবের পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। জাতিভেদ করিয়া যেরূপ বৌদ্ধ অভ্যুদয় হইল, এ বিষয়ে সেইরূপ সামাজিক মহদ্‌ঘটন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিসরদেশে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রদিগের পার্থক্য হেতুক

অকালে সমাজোন্নতিলোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য, এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ উচ্চবর্ণে ও নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এখানে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্য প্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়-সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ, লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপন হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজেকাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া ওঠে।

নেতৃপরীক্ষা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ইংরাজের স্থানে অনুকরণ করিবার অনেকানেক বিষয় ভারতবাসী আপনার সম্মুখেই পাইতেছেন। এখন ইংরাজ নানাপ্রকারেই তাঁহার আদর্শস্থলীয়। অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, ইংরাজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মূর্তিমান্ হইয়া আছে। ইংরাজের উচ্চাভিলাষ আছে, স্বাবলম্বন আছে, অধ্যবসায় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, গাম্ভীর্য্য আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আছে।

সম্মিলন শক্তিটিতে অনেকানেক উচ্চতম সদ্‌গুণেরই সত্তা বুঝায়। ইহাতে মনের সংযম বুঝায়, পরের সহানুভূতি বুঝায়, বশ্যতা বুঝায়, সত্যনিষ্ঠা বুঝায়। ভারতবাসীর সম্মিলনশক্তি ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ঐ শক্তিটিকে অধিকার করিবার জন্য বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয়-ভাবের পরিবর্তন অতি অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ জাতীয়-ভাব সম্মিলন প্রবণতার নামান্তর অথবা পরিণাম।

আমরা সম্মিলন প্রবণতা ইংরাজের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, তাঁহার প্রকৃত অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারতবাসীর যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলন প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্ন-প্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উপবাসে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান্ হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় অল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলন অক্ষমতা।

এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্তমান নেতা ইংরাজের সাক্ষাৎ চেষ্টায় কদাপি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইবার নহে। কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষ কর্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কিনা, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে তৎসম্বন্ধে আমাদের অবলম্বনীয় দুইটি। একটি এই যে, যখন কোন উচ্চতর সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহারও সেই বা তাদৃশ অন্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্য বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। উচ্চতর উদ্দেশ্যের সফলতায় অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ কাজ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—স্বদেশ প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা অপরিচিত হউন যে কোন স্বজাতীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাতে সদ্‌গুণ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। কারণ

জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটী তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড়লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বডলোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া-দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড়লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না, তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কডে ছ কডে দেখিতে চাই, অতএব ন-কডে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড়লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড়-লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, বৈজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের গুণগরিমা দেখিতে পাইব এবং তখন আর অর্থ পিশাচ, লুব্ধচিত্ত, অনুদার-প্রকৃতিক বৈদেশিকদিগকেই সর্ব্বগুণাধার বলিয়া মনে করিব না। তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দেশীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের অপমান, দেশীয় রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা এবং স্বজাতীয় লোকের কুৎসা প্রচার করিব না।

ভারতভূমি সত্যসত্যই রত্ন-প্রসবা। এখানে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হয়। তাহা না হইলে এত শত শত নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? যাঁহারা ছোট-খাট যেরূপ হউক, এক একটী সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে। তবে কি যে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে, তাহারই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত

করিয়া দিবেন ? তাহাও নহে। কিন্তু যদিও তাহাও ভাল, তথাপি কেহ কোন উন্মাদিনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হওয়া ভাল নয়। পরন্তু যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন। (২) তিনি সকল জাতি ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদবিষয়ক তত্ত্বের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার স্থাপনীয় মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রশস্ত সদুপায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। (৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীব্রবুদ্ধিমত্তা, অগাধপাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, জিগীষুশীলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর কোমল গুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্-বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ-সম্ভবম্।"

যাহাতে দেখা, শ্রী ও তেজ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত করিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বলিখিত লক্ষণ-সকলের যৎকিঞ্চিৎ যাঁহাতে পাইবে তাঁহাকেই গৌরব [illegible] করিও। [illegible] এই [illegible] অনুসরণ করিতে [illegible] করিলেই [illegible], তবে

অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

সাধারণের উন্নতি

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

কোনও একটী দেশে কেবল ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর জনকতক লোকের জ্ঞানার্জ্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও, সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। আমরা দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোকসকল অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্বসকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তাদ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই। কেবল একটী বিষয়ে অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মাদিগের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই,—নিম্নস্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই।

তবে যে আজকাল 'উন্নতি' 'উন্নতি' শুনা যায়, তাহা কেবল ছাদের কার্ণিশের পারিপাট্য মাত্র, ভিত্তিতে সেই পুরাতন ইটের কাঁচা গাঁথুনি পূর্ব্বের মতই আছে। বহুকালের গাঁথুনি বলিয়া এখন লোণা লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে। তখনও যে পাপে আর্য্যসমাজ অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে

উন্নতি এবং আমেরিকার অত্যুন্নতি। এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্তদ্বারা শিক্ষা সহজেই পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচজনের জন্য ভাবিতে শিখিব, আমি যদি আরও দশজনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশজনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে কেহ কোনও দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পর বুঝিতে পারে না।

যত দিন উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্নস্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে না শিখিবেন, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্য বেদনা বোধ করেন না, উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তিত করান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন এবং কার্য্যতঃ সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন।

আদর্শ বধূ

চন্দ্রনাথ বসু

[চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'সাবিত্রী তত্ত্ব' বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে তিনি সাবিত্রী-চরিত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া সাবিত্রীর মহত্ত্ব সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়াছেন। সাবিত্রীর বধূত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই অংশ গৃহীত হইয়াছে।]

এই যে মহানিষ্ট আমাদের মধ্যে ঘটিতেছে, এখনকার বাঙ্গালী মেয়েদের বধূ-ধর্ম্মের বিস্মৃতি তাহার একটী প্রধান কারণ। এই বিস্মৃতি উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, আদর্শ বধূ সাবিত্রীর কথা স্মরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। সাবিত্রী

"আমার পিতা ভূপতি অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন, অতএব কুলের সন্তানকর হইতে পারে তাঁহার এরূপ এক শত ঔরস পুত্র হউক, এই তৃতীয় বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি।"

পিতার সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ, শ্বশুরের সহিত বিবাহজনিত সম্বন্ধ। সুতরাং শ্বশুরের সহিত যে সম্বন্ধ, পিতার সহিত তদপেক্ষা গাঢ়তর ও নিকটতর সম্বন্ধ। যাহার সহিত গাঢ়তর ও নিকটতর সম্বন্ধ, মনের টান স্বভাবতঃ তাহার দিকেই প্রবলতর হইয়া থাকে। তথাপি সাবিত্রী প্রথম বর পিতার জন্য না চাহিয়া শ্বশুরের জন্য চাহিলেন, দ্বিতীয় বরও পিতার জন্য না চহিয়া শ্বশুরের নিমিত্ত চাহিলেন। তাহার পর শ্বশুরের নিমিত্ত যাহা প্রার্থনা করিবার অভিলাষ ছিল, তাহা শেষ করিয়া, তবে পিতার নিমিত্ত বর চাহিলেন। অর্থাৎ যাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক, গাঢ়তম ও নিকটতম, তাঁহার মঙ্গলকামনা অগ্রে না করিয়া, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ কেবলমাত্র বিবাহজনিত এবং গাঢ়ত্বে ও নৈকট্যে নিকৃষ্ট, সাবিত্রী অগ্রে তাঁহারই মঙ্গলকামনা করিলেন। এইরূপ করিবার অর্থ এই যে, সাবিত্রী শ্বশুরকে পিতারও উপরে আসন দিয়াছেন এবং পিতা অপেক্ষা অধিকতর আত্মীয়, বেশী আপনার মনে করিয়াছেন। বধূ হইলে সকল স্ত্রী-লোকেরই পিতা অপেক্ষা শ্বশুরকে অধিকতর উচ্চপদাধিষ্ঠিত এবং অধিকতর আপনার মনে করিয়া বধূধর্ম্ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে বধূধর্ম্ম পালনে বিষম ত্রুটী ঘটিয়া বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত দিয়া একথা বুঝাইবার প্রয়োজন আর নাই। এখনকার অনেক বাঙ্গালী বধূর পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, শ্বশুরের সংসার ছারখার করিবার যে কথা অব্যবহিতপূর্ব্বে * কহিয়াছি দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করা যাইতে পারে।

সাবিত্রীর যে কার্য্যের কথা উল্লেখ করা হইল, তাহাতে তাঁহার নিজের অসীম মহত্ত্ব এবং বধূধর্ম্মের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অতি পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। শ্বশুরকে পিতার অপেক্ষা বড় জ্ঞান করা, পিতার অপেক্ষা আপন মনে করা,

[* প্রবন্ধটির প্রথমদিকে লেখক একথা কহিয়াছেন]

বিরাট্ পুরুষ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর

[লেখকের সুপ্রসিদ্ধ নিভৃত চিন্তা'র অন্তর্গত 'বিরাট্ পুরুষ' শীর্ষক দার্শনিক প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। মানুষকে পৃথক্ পৃথক্ দেখিলে তাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির সমষ্টিগত শক্তি অসীম। লেখক এই প্রবন্ধে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"আপনা হইতে সমাজের দিকে চাও, কিংবা সমাজ হইতে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর, এই সার্ব্বজনীন বিরাট্ পুরুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রীণন ও পরিপোষণেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল ও প্রধানতম পার্থিব সুখ।"]

আমরা যখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বারিবিন্দু এবং একটি একটি করিয়া বালুকণা গণনা করি, তখন দ্রব ও ঘন পদার্থের প্রকৃত ভাব আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। কে দূর্ব্বাদল-বিলম্বি শিশিরবিন্দু দেখিয়া জলরাশির শক্তি চিন্তা করে? কে কুশাগ্রলগ্ন পুষ্পরেণু দেখিয়া পুঞ্জীকৃত রেণুনিচয়ের গুরুত্ব ও ভারবত্তা ভাবিয়া দেখে? কিন্তু যখন সেই বারিবিন্দু অসংখ্য বারিবিন্দুর সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া গঙ্গার প্রমত্ত স্রোতে কিংবা সাগরের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে নৃত্য করে,—যখন সেই বালুকণা অসংখ্য বালুকণার সহিত মিশ্রিতভাবে সমুচ্ছ্রিত শৈলস্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান হয়, আমরা তখন দৃষ্টিমাত্রই আকৃষ্ট ও আনত হই। মনুষ্য সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা মনুষ্যকে চিনি না, মনুষ্যের গৌরব বুঝি না। আমরা একটি একটি করিয়া মনুষ্য দেখি,—একটি একটি করিয়া মনুষ্য লইয়া বিচার বিতর্ক করি। তাহাতেই মনুষ্য-প্রকৃতি ও মানবী-শক্তির প্রকৃত মহিমা আমাদিগের চিন্তার আবিল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। মনুষ্যের অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদিগের চক্ষে পড়ে,—মনুষ্য কি করিয়াছে, কি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে কি করিবে বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, তাহা চিন্তায় আসে না। কাহারও উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, শরীর নানাবিধ বিকট ব্যাধিতে অকালজীর্ণ

জীবন এবং পশুজীবনের পরিণতিতে এই বিস্ময়াবহ মানবজীবনের ক্রমিক বিকাশ ঘটিয়াছে, ইতিহাস তাহা দেখে নাই। সুতরাং ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে অক্ষম। সেই অতীত তত্ত্ব অনুমানের অধিগম্য হইলেও, ইতিহাসের বিষয় নহে। ভূপঞ্জরনিহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ অস্থির সাদৃশ্য ও বিসদৃশতা এবং ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত আরও বহুবিধ কথার উপর নির্ভর করিয়া সে বিষয়ে একটা যৌক্তিক উপপত্তি করিবার সময় হইয়া থাকিলেও তাহা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু, কিরূপে অসহায়, অশিক্ষিত, অসভ্য মনুষ্য, জীবনের শৈশব-সময়ে, বন্য পশুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া, এইক্ষণে এই বিরাট্ বেশ ধারণ করিয়াছে,—যে এক সময়ে শীতবাতের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ভে কিংবা বৃক্ষকোটরে মাথা লুকাইত, সে কিরূপে আজি ভূপতির আসনে সমাসীন হইয়া সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের সকলরূপ সামগ্রীতেই বিলসিত রহিয়াছে,—যে এক সময়ে কথাটি কহিতেও অসমর্থ ছিল, তাহার মুখের কথা ও মনের ভাব কিরূপ এইক্ষণ অযুত ভাষায় অযুত প্রবাহে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলাইয়া বহিয়া যাইতেছে,—যে এক সময়ে আপনার দুই হাতের দশটি আঙ্গুলও গণিতে জানিত না, সে কিরূপে এইক্ষণ আকাশের তারা এবং গ্রহ উপগ্রহের ব্যবধানভূত রেখানিচয়কেও গণিতে শিখিয়াছে,—যে কোন তত্ত্বেরই কিছু জানিত না, সে কিরূপে জ্ঞানগম্য সমস্ত তত্ত্ব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ-যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা পৃথিবীকে আপনার ভাবে ওতপ্রোতরূপে একেবারে এইক্ষণ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, ইতিহাস ইহার সমস্তই পরিস্ফুট আলোকে অবলোকন করিয়াছে এবং এই কাহিনী কহিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়াই ইদানীং ইতিহাসের এত আদর বাড়িয়াছে।

—(*)—

এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি, ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক অত্যাচার এবং দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন যে, তদ্দ্বারা মানবাত্মা শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত হয়। এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আর এক দিকে অসাধারণ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনই একটা প্রভাব ছিল, এমনই একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্মশক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাহাকে কেহ দমাইতে পারিত না, কোনও বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে স্বকার্য্য সাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া তিনি অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহা ধরিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা সমাপ্ত না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয়-প্রদর্শনে ভীত হওয়া, লোকের প্রতিকূলতাবশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজের শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার নাই। এই জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বাধা, বিঘ্ন, পাপ, প্রলোভন প্রভৃতি জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়, তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বড়, আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এইজন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন তাহারও ভিতরকার কথা নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজেয় বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপাদান, সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই বিশ্বাস। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ফলাফল সেই ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহাভাব হইতে সকল ধর্ম্মবীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতেই উঠিয়াছিল। ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটী উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তিসকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দেহের বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধাসমুদয়, সেই মঙ্গলময় পুরুষের গচ্ছিত ধন, উহা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিবার জন্য, তাঁহারই প্রিয়-কার্য্য সাধনের জন্য, এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনও মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই; কোনও মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। সকল মহামনাঃ মানুষের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে, বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। এই যে জীবনের ভিতরে পবিত্র-স্থান, ইহা ভিন্ন কে কবে বড় হইয়াছে? কে কবে বক্তৃতাতে বাহবা লইয়াছে? কে কবে জীবন্ত রাষ্ট্র সংস্কারক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, "কে কি বলে বলুক, কে যা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি। আমার প্রতি যে ভগবানের [illegible] পড়িয়াছে, আমি তাহা সাধন করিয়া যাই।" এই প্রাতিস্থান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটী গুণ জন্মিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা পূর্ণভাবে না করিয়া ছাড়িতেন না, যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতেন। [illegible] অনুসারে কাজে হাত দেওয়া, অথচ [illegible] হয়, [illegible] এইরূপই [illegible] হয়, [illegible]

ঈশ্বরে যেমন তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনই মানবের প্রতি তাঁহার উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব হইতেই তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের কাহারও দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেইজন্য দুষ্কর নরসেবাব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূলমন্ত্র উঠিয়াছিল,—'মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা'। তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোনও জাতির কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে, তাঁহার প্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

সন্তোষ-ক্ষেত্র

রজনীকান্ত গুপ্ত

['হিউএনথ্ সঙ্গের ভারত ভ্রমণ' শীর্ষক কাহিনী হইতে এই প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে।]

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব ভারতের ইতিহাসের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার বিজয়-পতাকায় পরিশোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন, জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্র যখন আপনার অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমায় নালন্দার বিদ্যালয় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন মহারাজ শিলাদিত্য হিন্দুদের পবিত্র

তীর্থ প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এই মহোৎসবের কেন্দ্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি 'সন্তোষ-ক্ষেত্র' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিট-পরিমিত ভূমি গোলাপফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকট ভোজন-গৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এই সকল ভোজন-গৃহের একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়স্বজনশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও মিত্র রাজগণের সহিত এইস্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ ধ্রুবভট্ট এবং আসামরাজ ভাস্কর বর্মা এই মিত্র রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই দুই রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষ ক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবভট্টের সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্যক অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশীলতা ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিশৃঙ্খল সময়ে অথবা তৎপূর্বে সন্তোষ ক্ষেত্রে রক্ষিত ধন চৌরলোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহার সকল দিক্ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবভট্ট ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং [illegible] [illegible] সৈন্য স্থাপন করিতেন। [illegible] পশ্চিম দিকে আপনাদের সৈন্যনিবেশ করিতেন।

[illegible] আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত, কিন্তু হিন্দু-ভিন্নধর্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদর

সহকারে আহ্বান করিতেন এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দুদেবমূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিন সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন ব্যাপিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃ-হীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয় ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ-দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহু-মূল্য পরিচ্ছদ, মণি-মুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্যরক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্র-স্বভাব চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থ্ সঙ্ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভারতে প্রাচীন নৃপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্মসঞ্চয়

মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণের ও শ্রমণের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয়দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয় এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত, উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইঁহারা সর্ব্বদা দানশীল রাজার কুশল কামনা করিতেন এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এইরূপে রাজা সর্ব্বসাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। ইহা ভিন্ন যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া শেষে রাজ-সিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষ-ক্ষেত্রের দানে রাজার ধর্ম্মভাব প্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য-কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে সমুজ্জ্বল হয়। যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইংরেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক-সভ্যতা-স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গতি প্রসারিত না করিত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনার জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে এই প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির অপূর্ব্ব আড়ম্বর দেখা যাইত এবং আজও এই অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ অপার মহিমায় ভারতের উন্নতি সাধন করিত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে ভাসিতে থাকিত।

পরিব্রাজকের সমুদ্রযাত্রা

স্বামী বিবেকানন্দ

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই-বোন ছেলে-মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর যায়গা থাকে? এই অনন্ত শস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালাদেশের একটী রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুসলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল, নারিকেল, খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড-হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম লিচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ, ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে, দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্থানের গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুটে ঠিক কোরে রেখেচে জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস, গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে,

যে অবধি অল্প অল্প নীলাভ ধারা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে ক্রমে ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইঁটের পাঁজা, আর নামবেন ইঁটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল তমাল আম নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট কলের চিমনি।

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে "দূরাদয়শ্চক্র" ফক্র "তমালতালী-বনরাজি"* ইত্যাদি ও সব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেননি, সমুদ্রও দেখেননি, এই আমার ধারণা।†

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। [illegible]

---

* দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥—রঘুবংশ

† [illegible]

হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে" তবে এ জায়গা বলে—ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, "সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" বোলে।

কি সুন্দর। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতি-ভূষণা, সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ"। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপর উঠ্‌চে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীলপট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল, আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী, মহা গর্জ্জন বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজি মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েচে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত, পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান্ আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব্বে পদাচরণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি, সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্" মহাগীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল!

—(*)—

অহল্যাবাই

যোগীন্দ্রনাথ বসু

[১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে অহল্যাবাই মালবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হোল্‌কারের নরপতি মহ্লার-রাওএর পুত্র খাণ্ডেরাওএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিধবা হন। বিধবা হইবার বার বৎসর পরে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হয়। অহল্যার একটি পুত্র ছিল, সেও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অহল্যা অতি যোগ্যতার সহিত রাজ্য-শাসন করিয়া ও অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তিমতী ও ধর্মশীলা রাজ্ঞী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। লেখকের 'অহল্যাবাই' নামক চরিত্রগ্রন্থের শেষাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

অহল্যার জীবনের ইতিহাস হইতে আমরা অনেক সুন্দর উপদেশ লাভ করিতে পারি। মানসিক শক্তি যে কেবল পুরুষেরই একাধিকার নহে, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়। নারী হইয়াও তিনি, যেরূপ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলার সহিত, আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যে কোন পুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরবজনক, উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে, রমণীও যে পুরুষসুলভ সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের রমণী এক্ষণে অশিক্ষিতা ও অনাদৃতা। স্বামী, পুত্রের কার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষমা ভাবিয়া পুরুষ তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এদেশের রমণীর শক্তি ও সামর্থ্য সাগরগর্ভস্থিত রত্নের ন্যায় নিষ্প্রভ ও নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা রমণীকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিতা করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, নারী-প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, রমণীর পক্ষে কোমলতা এবং পুরুষের পক্ষে কাঠিন্য স্বাভাবিক, সুতরাং রমণীকে সংসারের কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোমলতা বিনষ্ট হইয়া, সংসারের অকল্যাণ সাধিত হইবে। এ কথা যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কোমলতা ও কাঠিন্যেরও এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। পুরুষ-প্রকৃতিতে

যেমন কেবলই কাঠিন্য থাকিলে, তাহা রুদ্রভাবে পরিণত হয়, নারী-প্রকৃতিতেও, তেমনই কেবলমাত্র কোমলতা থাকিলে, তাহা সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। বীণার প্রত্যেক তন্ত্রী হইতে একই মাত্র সুর সমুৎপন্ন হইলে তাহা প্রীতিকর হয় না, নরনারীর হৃদয়েরও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি হইতে, কঠোরতাই হউক, বা কোমলতাই হউক, একমাত্র ভাব উৎপন্ন হইলে তাহা আনন্দ ও তৃপ্তিদান করিতে পারে না। এইজন্য কঠিনের সহিত কোমলের এবং কোমলের সহিত কঠিনের সম্মিলন, নর, নারী উভয়েরই প্রকৃতির পক্ষে আবশ্যক। এই সম্মিলনের অভাব ঘটিলে মানসিক বৃত্তি সমূহের সম্পূর্ণ পরিস্ফুরণ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশের অনেকেই এ কথা স্মরণ রাখেন না। সেইজন্য তাঁহারা নারী প্রকৃতিতে কেবলমাত্র কোমলতারই বিকাশ দেখিতে চান। সাহস, তেজস্বিতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি গুণ পুরুষোচিত ভাবিয়া, তাঁহারা, রমণীতে তাহাদিগের পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই আদর্শ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রাচীন ভারত-সমাজে এ আদর্শ ছিল না। প্রাচীন ভারতে যিনি গণেশজননীরূপে মাতা এবং অন্নপূর্ণারূপে গৃহিণী, মহিষমর্দ্দিনীরূপে তিনিই আবার সমরাঙ্গণ-বিহারিণী। সেই আদর্শ হইতেই মহাশক্তির হস্তে পাশাঙ্কুশ ও বরাভয় যুগপৎ বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। নারী প্রকৃতি সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত প্রভৃতি ভারতের বীরজাতিগণের আদর্শও বঙ্গবাসিগণের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। বঙ্গসন্তান কেবলই কোমলতার পক্ষপাতী, কোমলতার প্রতি তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ বঙ্গরমণী স্নেহ, দয়া, সহিষ্ণুতা, প্রেম প্রভৃতি গুণে পৃথিবীর অপর কোন দেশের রমণীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট না হইলেও, সাধারণতঃ তেজোহীনা ও আত্মরক্ষণে অসমর্থা। অহল্যার প্রকৃতিতে তেজস্বিতার সহিত কোমলতার তাদৃশ সামঞ্জস্য হইয়াছিল বলিয়াই আমরা তাহার এরূপ প্রশংসা করিয়াছি এবং সেইজন্য তাঁহাকে নারী সমাজের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আধুনিক শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া অহল্যার দোষগুণ

পর্য্যালোচনা করা সঙ্গত হইবে না। সে আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, বুদ্ধের, সক্রেটিশের বা খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষকেও কেহ কেহ অজ্ঞ ও কুসংস্কারান্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। অহল্যা যে জ্ঞান ও যে ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, এবং আত্মজীবন তদনুসারে ভগবানের ও ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন কি না, তাহাই আমাদিগের বিবেচনার বিষয়। খ্রীষ্ট কেন চৈতন্যের ন্যায় কার্য্য করেন নাই, সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরোপকারব্রতে নিযুক্তা হন নাই, এ কথা বলাও যেমন সঙ্গত, দেবব্রাহ্মণ-সেবিকা অহল্যা আধুনিক কোন একেশ্বরবাদিনীর ন্যায় কার্য্য করেন নাই কেন, সে কথা বলাও তেমনই যুক্তিযুক্ত। বিধাতার দানের তিনি যে অপব্যবহার করেন নাই, আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে তিনি যে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ। তাঁহার স্রষ্টা তদনুসারেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিবেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অনেক রাজ্ঞী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একদিকে সতীধর্ম্ম, অপরদিকে ভগবদ্ভক্তি, নিঃস্বার্থতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা এবং বিনয় প্রভৃতি গুণে তাঁহার সমকক্ষা রাজ্ঞী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, বিবেচনা হয়। রাজ্ঞী শব্দে হিন্দুর যাহা আদর্শ, তাহা যেন তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। রাজ-সংসারের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও তিনি সর্ব্বত্যাগিনী এবং সর্ব্বজন-পূজ্যা রাজ্ঞী হইয়াও তিনি সকলের সেবিকা ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। সে বয়সে, সাধারণতঃ, ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু সংযম, সেবা এবং আরাধনা দ্বারা অহল্যা নিজের হৃদয়ে এরূপ কঠোর বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছিলেন যে, তপস্বিনীগণের পক্ষেও তাহা প্রার্থনীয়। সংসারের প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মদৃষ্টি, অথচ কোন বস্তুতেই আসক্তি নাই, ইহাই হিন্দুর সংসারধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। অহল্যার জীবনে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। রাজ্ঞীরূপে তিনি

আপনার কর্ত্তব্য কিরূপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচিত হইয়াছে। তিনি যদি দরিদ্রের গৃহিণী হইতেন, তাহা হইলেও যে তিনি, নিজের ব্যবহারে তাঁহার স্বামী পুত্রের জীবন আনন্দময় করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কোন অবস্থাতেই হউক, কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ইচ্ছুক ও সক্ষম ব্যক্তিই পূজার্হ! অহল্যা সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থাতেই, আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদিগের এরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী। অহল্যার সমকালবর্ত্তিগণ তাঁহাকে জীবন্মুক্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, শূদ্রাণী হইয়াও তিনি, জীবদ্দশায়, ব্রাহ্মণগণের বন্দনীয়া হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বদেশীয়গণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, নিম্নলিখিত একটী মহারাষ্ট্রীয় কবিতার অনুবাদ হইতে প্রতীয়মান হইবে। কবিতাটি অহল্যার সমকালবর্ত্তী, পুনার রাজকবি, ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ময়ূরপন্থের বিরচিত,—

"হে দেবি! অহল্যে! তুমি ধরণীর ভূষণস্বরূপা, বরেণ্যা ও হরিহরের প্রতি সমান ভক্তিমতী, সূর্য্যসম তেজস্বী ব্যক্তিরা তোমার সৎকীর্ত্তি খ্যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাণ-কন্যা উষা অপেক্ষা তোমাকে সমধিক গুণশালিনী বলিয়া বর্ণনা করেন।

"দেবি, অহল্যে। তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা হইয়াছ। কলিকালে তোমার ন্যায় ধর্ম্মনিরতা কোন রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শুনি নাই।

"যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রুত হইয়াও তাহার আচরণ করে না, সেই সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির কে প্রশংসা করে? (তাই বলিতেছিলাম) তোমার ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্মনিরতা রমণীর কথা কলিযুগে শ্রুত হওয়া যায় না।

"পার্ব্বতী অথবা সীতারূপে তুমি অবতীর্ণা হইয়াছ। রাজন্যবর্গের যোগ্য সৎকীর্ত্তি-জনিত খ্যাতি তুমি অল্পদিনের মধ্যেই লাভ করিয়াছ।

"হে দেবি! তুমি নর্ম্মদাতীর পরিত্যাগ করিতেছ না, কারণ নর্ম্মদা তোমার প্রিয়-সখী। নর্ম্মদা গঙ্গার ও সখী, সেই সখীত্ব সূত্রেই কি তুমি এরূপ পূতহৃদয়া হইয়াছ?

"গয়ার শ্রীবিষ্ণু-পদের অর্চ্চনার সহিত তোমারও প্রতি সম্মান-প্রকাশ

ভক্তগণের কর্ত্তব্য।* সমগ্র বিশ্ব যাহার বন্দনা করে, কবি ময়ূর কেন না তাঁহার বন্দনা করিবে?"

তাঁহার কৌষেয় বসন-পরিহিতা, ব্রতখিন্না, ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার প্রজাগণের হৃদয় মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইত। স্বভাবতঃ করুণাময়ী রমণী রাজ্ঞী হইলে তাঁহার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এবং সর্ব্বত্যাগিনী হিন্দুবিধবা, আত্মসুখনিরপেক্ষ হইয়া, কিরূপে সর্ব্বভূতের মঙ্গলসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। সহস্র সহস্র নরনারীর সুখ-দুঃখের গুরুভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল; কিন্তু তাঁহার গৌরবের বিষয় এই যে আত্মসুখের জন্য তিনি কখনও কাহাকেও অসুখী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, ভারতীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীই তাহার প্রমাণ, ভারতবর্ষ অনেক মনস্বিনী রমণীর জন্মভূমি, তাঁহাদিগের সকলের নামের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া অহল্যারও নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইবে।

—(*)—

টাইট্যানিকের তিরোধান

বিপিনচন্দ্র পাল

আপনাদের অসাধারণ কৃতিত্বের উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নিরতিশয় স্পর্দ্ধা সহকারে যাত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকারের সুখসৌখীনতার ও ভোগ বিলাসের লোভ দেখাইয়া, এবং সমুদ্রযাত্রার সর্ব্ববিধ বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে একান্ত

* গয়ার শ্রীমন্দিরে অহল্যার দেহ-প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে সেই তাহা ভক্তগণ কর্তৃক দেবোচিত প্রকারে অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

অভয়দান করিয়া, আপনাদের নিয়ন্তৃ সমিতির বা Board of Directors-এর সভাপতি মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া, যাত্রী, কর্ম্মচারী ও নাবিক সকলে মিলিয়া প্রায় তিন হাজার স্ত্রীপুরুষ লইয়া, হোয়াইট্ ষ্টার কোম্পানী টাইট্যানিককে * আটল্যান্টিকের বুকে ভাসাইয়া দিলেন। প্রহরে প্রহরে অদৃশ্য ঈথর-স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়া, তারহীন তড়িতবার্ত্তা সাগরবক্ষঃস্থ টাইট্যানিকের গতিবিধির সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিপুলকায় জাহাজখানি নির্ভয়ে ও সদর্পে সমুদ্র তরঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া চলিতেছিল, তার বুকের উপরে সহস্রাধিক নরনারীও সেইরূপ ভয়-ভাবনা-বিরহিত হইয়া, হাস্য পরিহাসে, নাচে গানে, দিন কাটাইতেছিলেন। এইরূপে এই বিশাল প্রাণের পসরা সাজাইয়া টাইট্যানিক আনন্দে আপনার গন্তব্যের দিকে, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

কিন্তু তার কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহার যে গন্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গন্তব্য লাভ তাহার ভাগ্যে ছিল না। সভ্যতার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব হরণ করিবার জন্য, বিষয়বিমূঢ় জনগণের চিত্তে সাড়া আনিবার জন্য পুরুষকারের উপরে যে দৈব আছেন এই জ্ঞান জানাইবার জন্য, সংসারমোহ-বিভ্রান্ত স্বরূপভ্রষ্ট সভ্য জীবের স্বরূপ চৈতন্যের সঞ্চার করিবার জন্য, কামোপ-ভোগপরমা সভ্যতা ও সাধনার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য, 'নাস্তদস্তীতিবাদী' ইহ-সর্ব্বস্ব জনগণের প্রাণে অমৃতত্ত্বের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, ভোগসর্ব্বস্ব সমাজকে ত্যাগের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য—বিধাতাপুরুষ টাইট্যানিকের আর এক গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। টাইট্যানিক সে সাংঘাতিক নিয়তি প্রাপ্ত হইয়াই আপনার চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। আকাশে মেঘ নাই। অগণ্য নক্ষত্ররাজি দশদিক্ পূর্ণ করিয়া হীরার হাট খুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণপক্ষের নিশির অন্ধকারও নাই।

* এই জাহাজখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রে ভাসমান বরফস্তূপের সহিত সংঘর্ষের ফলে জলমগ্ন হয়।

শান্ত সুপ্রসন্ন প্রকৃতিমুখে নির্ম্মমতার আভাসমাত্র নাই। অপূর্ব্ব রচনাকৌশলগুণে বিপুলকায় অর্ণবপোতের জলমগ্নের আশঙ্কার লেশমাত্র নাই। তড়িতালোক-সমুজ্জল, বিবিধ কলাকৌশলপূর্ণ, প্রমোদপ্রবাস মুখরিত ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অর্ণব-পোত আশ্রয় করিয়া দ্বিসহস্রাধিক আরোহী নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে অকূল জলরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। কেহ বা শুইয়াছে, কেহ বা শয়নের আয়োজন করিতেছে। কেহ বা ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে, কেহ বা সঙ্গীতালাপ করিতেছে। কেহ বা আরামচৌকিতে বসিয়া নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছে, অপর কেহ বা ডেকের উপর পাদচারণ করিতে করিতে প্রণয়ী জনের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। কেহ বা ধনের, কেহ বা দারিদ্র্যের, কেহ বা প্রেমের, কেহ বা প্রতিযোগিতার, কেহ বা জ্ঞানের, কেহ বা ললিতকলার, কেহ বা দুঃখের, কেহ বা সুখের ভাবনা ভাবিতেছে। দুনিয়ার সকল ভাবনার বোঝা লইয়া টাইট্যানিক শান্ত সমুদ্রাম্বুরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে—নাই কেবল সে বিচিত্র পসরায় এক মৃত্যুর ভাবনা। সহসা যখন মরণের ডাক পড়িল, জাহাজের কল যখন বন্ধ হইয়া গেল, আরোহিগণের প্রাণরক্ষার জন্য লাইফ-বোট, বা জীবন-তরণীগুলিকে জলে নামাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, সকলকে ডেকে যাইয়া দাঁড়াইবার জন্য যখন কাপ্তেনের হুকুমজারী হইল, তখনও সকলের প্রাণে সাড়া পড়িল না। কালের ভেরী বাজিল, তথাপি অনেকে ক্রীড়াকৌতুক ছাড়িল না, অনেকের গীতবাদ্য থামিল না। বিজ্ঞানের প্রামাণ্যকে নষ্ট করিয়া, সভ্যতার অসাধারণ কৃতিত্বাভিমানকে চূর্ণ করিয়া স্থির সমুদ্রে নির্ম্মল আকাশতলে টাইট্যানিক যে সহসা অতলে ডুবিবে বা ডুবিতে পারে, অনেকের মনে এ কল্পনাও উদয় হয় নাই। প্রথমকার এ ভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরে যখন বিপদ যে সত্য, মৃত্যু যে সন্নিকট এ বিষয়ের তিল পরিমাণ সন্দেহের আর অবসর রহিল না, তখনও যে কেন এই দ্বিসহস্রাধিক আরোহী এবং নাবিকেরা ভয়-বিক্ষিপ্ত হইয়া, শৃঙ্খলমুক্ত পশুর ন্যায় কে কাহাকে মারিয়া আপনাকে বাঁচাইবে সে চেষ্টায় জাহাজখানি বহুকোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিল না, এ রহস্য ভেদ করা সহজ

নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে আধুনিক সভ্যতা, হয় মানুষকে সর্ব্বপ্রকারের সাধারণ মানব-ধর্ম্ম-বিরহিত কাষ্ঠলোষ্ট্রে পরিণত করে, না হয় দেবত্বে উন্নীত করিয়া তোলে। এ সকল কি মোহের না মোক্ষের লক্ষণ? টাইট্যানিকে যাহা দেখিলাম তাহা কি জড়ত্ব না বীরত্ব?

আর এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, আমরা য়ুরোপকে সচরাচর ইহসর্ব্বস্ব বলিয়াই মনে করি। য়ুরোপ ভোগের সন্ধান পাইয়াছে, ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও লাভ করিতে পারে নাই, অনেক সময়ে আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। সুতরাং টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ যাহা দেখাইল, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা সহজে ধরিয়া উঠিতে পারি না। কখনো মনে হয়, আমরা য়ুরোপকে যাহা বুঝিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর কখনো মনে হয়, বুঝি বা টাইট্যানিকের তিরোধানের যে কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে কল্পিত। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বধারণাও একান্ত মিথ্যা নহে, আর আজ যে ছবি দেখিলাম, তাহাও নিতান্তই কল্পিত নহে। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা যে ত্যাগের পথ ধরিয়া যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে, য়ুরোপ যে সে পথেরই সন্ধান পাইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহা প্রমাণ হয় না। ভারতের পথ চিরদিনই ত্যাগের পথ। য়ুরোপের পথ চিরদিনই ভোগের পথ। ভারতের যতই কেন আত্মবিস্মৃতি জন্মাক্ না, সে কখনো একান্তভাবে য়ুরোপের ভোগের পথ ধরিতে পারিবে না। আর য়ুরোপের যতই কেন ক্ষণিক শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হউক না, সে-ও কখনো ভারতের সেই প্রাচীন ত্যাগের পথ ধরিতে পারিবে না। ভারত যদি য়ুরোপের অদ্ভুত অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার ভোগের পথ ধরিতে যায়, তাহাতে আত্মচরিতার্থতা লাভ করা দূরে থাকুক্, সে নিষ্ফল প্রয়াসে তাহার ভাগ্যে কেবল আত্মঘাতী পরধর্ম্ম লাভই ঘটিবে। আর য়ুরোপও যদি ভারতের প্রাচীন পারমার্থিক সম্পদের অতি-লৌকিক শক্তি দর্শনে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পরধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হয়, সে প্রয়াসও তাহার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার আত্যন্তিক ভোগলালসা আপনার চরিতার্থতার জন্যই যে সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধান-কালে তাহারই শ্রেষ্ঠতম ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আধুনিক ভোগের আয়োজন করিতে হইলে, বহুলোকের সমবেত শ্রম ও সাহচর্য্য প্রয়োজন হয়। টাইট্যানিক আপনি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এত বড় বিপুলকায় অর্ণবযান পরিচালনার জন্য বহুলোকের আবশ্যক হয়। এই বহুসংখ্যক নৌ-কর্ম্মচারী ও নাবিকদিগের পরিচালনার জন্য প্রত্যেক কর্ম্মাকর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করা ও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই সকল ব্যবস্থার উপরেই যখন এত আরোহীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন-মরণ নির্ভর করে, তখন এ সকলের বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয় যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কঠোর শাসনেরও প্রয়োজন হয়। এক একখানি সমুদ্রগামী জাহাজ এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের মত। কাপ্তান সেই রাজ্যের রাজা। জাহাজের কর্ম্মচারী এবং আরোহী সকলকেই কাপ্তানের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হয়, না চলিলে জাহাজ পরিচালনা অসম্ভব এবং এত লোকের প্রাণরক্ষা অসাধ্য হইয়া পড়ে। সেনা-শিবিরে প্রত্যেক সেনাপতির যে প্রভুত্ব ও অধিকার, সমুদ্রগামী জাহাজে কাপ্তানের সেইরূপ অধিকার ও প্রভুত্ব রহিয়াছে। এখানে নাবিক ও আরোহী সকলেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা,—জাহাজের কাপ্তান, যাহারা এই সকল জাহাজে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে ও এই সকল জাহাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই জাহাজের বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতে ও কাপ্তানের আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর এই অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহারা এক প্রকারের সংযম শিক্ষাও করিয়া থাকে। এই সংযমের গুণেই আসন্ন মৃত্যুর মুখেও টাইট্যানিকের দ্বিসহস্রাধিক আরোহী ও নাবিক বিন্দুমাত্র ভয়বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই।

এ তো গেল বিশেষ ব্যবহার ও বিশেষ বিধানের কথা। ইহার অন্তরালে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মও বিদ্যমান ছিল। এই সভ্যতা ও সাধনা, যতই কেন ভোগপ্রধান হউক না, ইহার পারমার্থিক দৃষ্টি

অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও, পরার্থপরতা বস্তুতঃ সামান্য নহে। বিধাতার রাজ্যে অত্যন্ত ভোগী যে সে-ও কখনও নিতান্ত একাকিত্বের মধ্যে কিছুই ভোগ করিতে পারে না। জনসমাজই একদিকে যেমন ত্যাগের, অন্যদিকে সেইরূপ ভোগেরও একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। একান্ত একাকী হইয়া যে থাকে, সে যেমন ত্যাগের অবসর পায় না, সেইরূপ ভোগের আয়োজনও করিতে পারে না। ভোগের মাত্রা যতই বাড়িয়া যায়, ততই দশজনকে মিলাইয়া, দশজনের শক্তি সাধ্যের সমবায়ে সেই ভোগের আয়োজনও করিতে হয়। আর এইরূপে দশজনে মিলিয়া কোন কিছু করিতে গেলেই প্রত্যেকের স্বার্থপরতাকে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়। এই সমবায়ের সূত্র ধরিয়াই য়ুরোপ এতটা অভ্যুদয় সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আর দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে যাইয়াই য়ুরোপীয় সমাজে এক প্রকারের পরার্থপরতারও বিকাশ হইয়াছে। এইরূপে দেশের জন্য ও দশের জন্য ত্যাগস্বীকার করা য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার একটী সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই য়ুরোপের জাতীয় চরিত্রে একটা অতি উদার বিশ্বপ্রেমের আদর্শও ফুটিয়া উঠিয়াছে। টাইট্যানিক তিরোধানকালে আমরা সেই সকলেরই একটা অতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি ত্যাগের পথে যাইয়া ভারত মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল। ভোগের পথে যাইয়া য়ুরোপ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। ভারত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মা সাধন করিয়া আপনি সুখদুঃখের অতীত হইয়াও জগতের সুখকেই আপনার সুখ ও জগতের দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ ও ভোগ করিবার নিগূঢ় সঙ্কেত লাভ করিয়াছিল। এই মহাপরিনির্ব্বাণের সুখ-দুঃখের তত্ত্ব য়ুরোপ জানে না। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থার সংবাদ আধুনিক সভ্যতা রাখে না। কিন্তু আপনি সুখ চাহে বলিয়া, য়ুরোপ অপরকেও সুখী করিতে চাহে এবং আপনি দুঃখের তীব্র হলাহল পান করিতেছে বলিয়াই, সে বিষের যাতনা জানে এবং তাহারই জন্য জগতের দুঃখী তাপীর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে এবং সেই দুঃখ ও সেই বেদনা উপশম করিবার জন্য কখনও কখনও শ্রম বা ত্যাগ

স্বীকার করিতেও বিমুখ হয় না। টাইট্যানিকের তিরোধানে কি করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে হয়, তাহাই দেখিলাম। কেমন করিয়া অপরের সুখে সুখানুভব ও অপরের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়, তাহাও দেখিলাম। কাম্যবস্তুর অন্বেষণ করিতে যাইয়াও যে অসাধারণ সংযমের প্রয়োজন হয় এবং সেই অপরিহার্য্য সংযমের মধ্য দিয়াই যে অতি উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বও ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং এই পথে যাইয়াও যে সুকৃতিসম্পন্ন লোকে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ লাভ করিতে পারেন, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহাও দেখিলাম। এ সকল দিকেই আধুনিক য়ুরোপীয়-সাধনা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টাইট্যানিক আধুনিক য়ুরোপের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অন্যতম নিদর্শনরূপে গঠিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপীয় কর্ম্মিগণের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সগর্ব্বে সাগরবক্ষে ভাসিয়াছিল। আর য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ব ভোগ-প্রধান সাধনার মূলেও যে ভাগবতী লীলাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠতম যোগশক্তি ও মোক্ষসম্পদ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, ইহা প্রমাণ করিয়াই টাইট্যানিক অতল সাগরতলে অন্তর্হিত হইয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ মহীয়ান্ ও জগৎ লাভবান্ হইয়াছে।

পরিমিত ভোজন ও দীর্ঘজীবন লাভ

চুণীলাল বসু

পরিমিত ভোজন প্রকৃত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবার একটি প্রধান উপায়। অনেকের বিশ্বাস যে যৌবনকালে যাহারা অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারে, তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়। এ বিশ্বাস ভ্রমশূন্য নহে। হইতে পারে যে দুই চারিজন গুরুভোজীকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু গুরুভোজন অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ রোগ ও

অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে গুরুতর আহারে কেন শরীর নষ্ট হইয়া যায়। কোন একটি যন্ত্রের কার্য্য করিবার সীমা যে পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা তাহাকে অধিক কার্য্য করিতে দিলে শীঘ্রই যেমন উহা বিকৃত হইয়া যায় এবং কিছুদিন পরে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের শারীরিক যন্ত্রদিগকে তাহাদিগের শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিলে তাহারা শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আমাদিগের অকালমৃত্যুর কারণ হয়।

গুরুভোজন করিলে গৃহীত খাদ্যের অধিকাংশই আমাদের শরীররক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় না। শারীরিক যন্ত্রাদি প্রথমতঃ খাদ্যের এই অতিরিক্ত অংশকে দেহের কার্য্যে লাগাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পায়। এই অনাবশ্যক চেষ্টায় তাহাদিগের যথেষ্ট পরিশ্রম এবং শক্তির অযথা ব্যয় হইয়া থাকে। পরে যখন এই অতিরিক্ত খাদ্য শরীরের কোন কার্য্যে লাগে না, তখন তাহাদিগকে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিবার জন্য অপর কতকগুলি দেহ-যন্ত্রকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ কোন কার্য্যে না আসিলে উহারা নানারূপ দূষিত পদার্থে পরিণত হয় এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে বিকৃত করিয়া বহুমূত্র, বাত, অজীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ উৎকট রোগ উৎপাদন করে। সুতরাং গুরুভোজনে শরীরের যন্ত্রাদি যে শুদ্ধ ক্ষীণশক্তি হয়, তাহা নহে, খাদ্যের বিকৃত অংশ রক্ত দূষিত করিয়া স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও অকালমৃত্যুর কারণ হয়। পরিমিত আহার দীর্ঘজীবন লাভের যে একটি প্রধান উপায়, সকল স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকেই তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ইতিহাসে যে সকল দীর্ঘজীবী লোকের উল্লেখ আছে, তাহারা প্রায় সকলেই অতিশয় মিতাহারী ছিলেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা গ্লাডষ্টোন্ ৮৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ এবং শরীরে প্রচুর বল ছিল। তিনি আজীবন মিতভোজী ছিলেন। দুগ্ধ, রুটী ও আলু তাঁহার প্রধান আহার ছিল। অতি

সামান্য পরিমাণে মাংস তিনি ভোজন করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ৮২ বৎসর পর্য্যন্ত অসামান্য মানসিক শক্তিবলে ও সুস্থদেহে এই বিশাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম পরিমিত-ভোজী ছিলেন। মিতভোজনে যে দীর্ঘজীবন লাভ হয় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

মিতভোজন যে-কোন বয়সে আরম্ভ করিলেও উহার সুফল শীঘ্র ফলিতে দেখা যায়। ভিনিস্ দেশবাসী লুই কর্ণারো ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। এই ব্যক্তি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পান ও ভোজন সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার আচরণ করিয়া শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ উৎকট রোগ শরীরে সঞ্চারিত হইয়াছিল যে চিকিৎসকেরা তাঁহাকে ২।৪ বৎসরের অধিক বাঁচিবার আশা প্রদান করেন নাই। ৪০ বৎসর বয়সে লুই কর্ণারোর চৈতন্যের উদয় হয়। তিনি নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করেন এবং পানদোষ পরিত্যাগ করিয়া আহারাদি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ মিতাচারী হইলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার সুফল দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শরীর নীরোগ ও সবল হইল এবং ১০০ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি স্বচ্ছন্দে সুস্থদেহে বাঁচিয়াছিলেন।

অবশ্য শুদ্ধ পরিমিত আহার করিলেই দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। মনের অবস্থার উপর শারীরিক অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভর করে। দুশ্চিন্তা, সাংসারিক বিপদে মানসিক কষ্ট ও অবসাদ, বিষয়কর্ম্মে সাতিশয় উদ্বেগ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অস্বাস্থ্যকর ব্যবসা অবলম্বন, পিতৃপুরুষ হইতে অর্জ্জিত রোগ ভোগ ইত্যাদি নানাকারণে অকাল বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল ব্যাঘাত সত্ত্বেও ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে মিতাহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

—:•:—

মেবার পতন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[মহাবীর প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর অমরসিংহ মেবারের রাণা হন। জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার না করায় অমরসিংহের বিরুদ্ধে এক বিপুল মোগলবাহিনী প্রেরিত হয়। অমরসিংহ অস্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার মধ্যে পিতার শৌর্য্য-বীর্য্য শতাংশের একাংশও ছিল না। তিনি মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সগরসিংহ অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন, তাঁহার কন্যা সত্যবতী চারণীর বেশে রাজপুতগণের পূর্ব্বগৌরব গীতি গাহিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিত। মেবার মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবার পর তাহার সহিত অমরসিংহের কন্যা মানসীর কথোপকথন এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।]

সত্যবতী। মানসী! তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। বাবা ফিরে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ মা।

মানসী। মোগলের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে?

সত্যবতী। না, রাণা দেখলেন যে সাহাজাদা খুরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে' পত্র লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা। সে একটা আকাশকুসুম, একটা মৃগতৃষ্ণিকা।

মানসী। কেন মা?

সত্যবতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—মানসী! বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্ত্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না। সাহাজাদা চান যে, রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়ে সম্রাটের ফর্ম্মান্ নেন। মানসী! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

মানসী। বাবা কি কর্ব্বেন?

সত্যবতী। রাণা আজ সামন্তদের ডেকে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন। তিনি রাণীর সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনে বাস কর্ব্বেন। আজ মেবারের পতন হ'ল মানসী!

মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হ'ল? না মা, তার পতন আজ হয়নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্বে হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন

সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থি মাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, মা?

মানসী। যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে, সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম— আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে ক্রন্দন কর্লে কি হবে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক্, তার চেয়ে বড় সম্পদ্ আমাদের হোক! আমি চাই যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান্ হোক, যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক্। যদি তা সে না করে, ত' সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো তাকে তুল্‌তে। তবু যদি না পারি— ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্ব চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়—ত' মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্। দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক্।

সত্যবতী। তা কি হবে, মা?

মানসী। কেন হবে না। আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখন নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে হবে?

মানসী। যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজে আবার ভাবতে শিখ্‌বে, যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে, যেদিন তারা যা উচিত যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তা করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখ্‌বে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণা কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা, আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখ্‌তে হবে। তার পরে আর—তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনি গড়ে আস্‌বে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নইলে নিজে নীচ কুটিল স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ-প্রদীপ কোলে করে' চিরজীবন হাহাকার কর্লেও কিছু হবে না।

—:*:—

সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রথম অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ। কাল—প্রাতঃ।

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কচ্ছি। সে

আমার পুত্র, আমার উদ্ধত বিজয়ী পুত্র,—আমার লজ্জা—আমার গৌরব।

জাহানারা। গৌরব পিতা! এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে। সে দিন যখন আমি তার শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে, ব'ল্লে যে সে মহাপাপ করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দু এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে, বল্লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পার্লে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তার সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। সে তাদের অমনি বন্দী করেছে। আমি দারাকে পত্র লিখেছিলাম। পথে সে পত্র সে হস্তগত করেছে।—এত কপট। এত ধূর্ত্ত।

সাজাহান। না জাহানারা। তা সে কর্ত্তে পারে না। না না না। আমি একথা বিশ্বাস কর্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তাকে বন্দী কর্ব্ব। ঐ কক্ষে একশত সৈনিক গুপ্তভাবে রেখেছি। তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা। সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। না জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব। তাতেও যদি সে বশ না হয়—তা হ'লে তার কাছে, পিতা আমি—তার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে—আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো। বল্‌বো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালবাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা।

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

(মহম্মদের প্রবেশ)

সাজাহান। এই যে মহম্মদ। তোমার পিতা কৈ।

মহম্মদ। তা ত জানি না, ঠাকুর্দ্দা।

সাজাহান। সে কি। সে এখানে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—শুন্‌লাম

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়তে গেলেন। আমি ত যতদূর জানি, তাঁর এখানে আস্‌বার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ?

মহম্মদ। এ প্রাসাদ দুর্গ অধিকার কর্ত্তে।

সাজাহান। সে কি!—না তুমি পরিহাস কর্চ্ছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দ্দা, এ সত্য কথা।

জাহানারা। তবে আমি তোমাকেই বন্দী কর্ব্ব।

(বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ।)

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ!

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী। সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও!

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হ'লো। [*বাঁশী বাজাইলেন*]

(দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ)

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে দিল?

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহ-বশে, ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল সব দিয়েছিলাম। ওঃ আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি, মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো যে, আমি তোমার হাতে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী নন, ঠাকুর্দ্দা। তবে বাহিরে যাইবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান। তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে তরবারি খুলে!—একি। এক দিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল? একদিন যার রোষকষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্দ্ধেক মাটির

মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার—পুত্রের হাতে সে বন্দী! জাহানারা! কৈ! এই যে! একি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়্‌ছে, কথা বাহির হচ্ছে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্যদৃষ্টি নির্গত হচ্ছে, গণ্ড দু'টি ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা!—কিন্তু জান্তে পার্লে কেমন করে।—আমি শুদ্ধ তাই ভাবছি।

সাজাহান। মহম্মদ। ভেবেছো আমি এই শাঠ্য এই অত্যাচার—এখানে এই রকম বসে' নিঃসহায় ভাবে সহ্য কর্ব্ব! ভেবেছ এই কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তাকে পদাঘাত ক'রে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে। কিন্তু আমি সাজাহান।—এই কে আছো! নিয়ে এস আমার বর্ম্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বাহির করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায়। এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীর কাজ কর্ব্বে।

সাজাহান। মহম্মদ। বিশ্বাসঘাতক?

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব।—না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়!—তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাহিরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্ত্তাম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে লুয়ে পড়তো। -একবার খোলা পাই না। একবার খোলা পাই না!—মহম্মদ। আমায় একবার মুক্ত করে' দাও!—একবার! একবার।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে।—মহম্মদ। এসো। দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা করিবেন ঠাকুর্দ্দা। আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাহিরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো শপথ কচ্ছি।—দেবে না।—দেবে না।

মহম্মদ। ক্ষমা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা—আমি তা পার্ব্বো না। [গমনোদ্যত]

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া) দেখ মহম্মদ। এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই কোরাণ স্পর্শ করে আমি শপথ কর্চ্ছি—যে বাহিরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো। কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ বৃদ্ধ, শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে। কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান এ ভারতবর্ষ এতদিন ধরে' এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে তা হলে শুদ্ধ তাদের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হ'য়ে পড়ে' যাবে—মহম্মদ। আমায় মুক্ত করে' দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে। আমি শপথ কর্চ্ছি মহম্মদ। শপথ কর্চ্ছি। আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখ্‌বো মহম্মদ।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাজাহান। দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরাণ স্পর্শ করে' শপথ কর্চ্ছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কর্চ্ছি—দেখ একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্ত্তে।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমি আমার পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও নয়?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও নয়।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ। বিবেচনা ক'রে দেখ। ভালো ক'রে বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে একথা শুন্‌বো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্বেন।

[প্রস্থান]

সাজাহান। চলে' গেল। চলে' গেল! জাহানারা কথা কচ্ছিস্ না যে।

জাহানারা। ঔরংজীব। তোমার এই পুত্র! যে তার পিতার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তাকে ছলে বন্দী করেছো।

সাজাহান। সত্য বলেচো কন্যা।—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না, বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না, তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তারা সব শিশু শয়তান। তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তাদের সকালে বিকালে জোরে কশাঘাত কোরো। তাদের সারাজীবনটা চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ হয় তারা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত, বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে, ত' চোখ উপড়ে তুলে ফেলো আর্ত্তনাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ত' নিজের টুঁটি চেপে ধোরো।—উঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে' অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন কর্লে কিছু হবে না. পদাহত পশুর মত বসে' বসে' গর্জ্জন করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে না, পাপী ফকিরের মত অদৃষ্টের এ ব্যবস্থা ঈশ্বরের 'মঙ্গলময় ব'লে' ভাবলে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার

করে' উঠুন, হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিয়তির মত কঠিন হৌন্, হিংসার মত অন্ধ হৌন্, শয়তানের মত ক্রূর হৌন্। তবে তার সঙ্গে পার্ব্বেন।

সাজাহান। উত্তম। তবে তাই হোক্। আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চূরে দিয়ে যাব, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে আয়। আয় ত, একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চলে' যাই—তারপর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। ধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় উর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

—(*)—

খদিরাঙ্গার জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

["বৌদ্ধদিগের মতে জাতকগুলি ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার বিভূতি-সম্পন্ন সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না, তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটি-কল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ব্ব-প্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্ব-নিবাস জ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্মবৃত্তান্ত সমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান। গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় জন্মান্তরের গুপ্ত কথাসমূহ শুনাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণ-সমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন।"]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রাজপুত্রবৎ লালিত পালিত হইতেছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিপদে নিয়োজিত হইলেন এবং নগরে ছয়টি দানশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটি নগরের দ্বারচতুষ্টয়ের নিকট, একটি নগরের মধ্যভাগে এবং একটি তাঁহার নিজ বাসভবনের পার্শ্বে নির্ম্মিত হইল। তিনি এই সকল স্থানে প্রচুর দান করিতেন এবং শীলসমূহের পালন ও যথাশাস্ত্র প্রতিমোক্ষ (১) শ্রবণ করিয়া চলিতেন।

একদিন এক প্রত্যেক-বুদ্ধ (২) সপ্তাহস্থায়ী সমাধিভঙ্গের পর ভিক্ষাচর্য্যাবেলা সমাগত দেখিয়া ভাবিলেন, আজ বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষা করা যাউক। তখন তিনি তাম্বুল-লতাখণ্ড দ্বারা দন্তধাবন করিলেন, অনবতপ্তহ্রদে (৩) মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মনঃশিলাতলে দণ্ডায়মান হইলেন, কটিবন্ধ গ্রহণ করিলেন, চীবর পরিধান করিলেন এবং যোগবলে মৃন্ময়পাত্র আহরণপূর্ব্বক, যখন বোধিসত্ত্বের প্রাতরাশের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ও মুখরুচিকর খাদ্য আনীত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আকাশপথে তাঁহার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ভৃত্য কহিল, "আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস।"

তন্মুহূর্ত্তেই পাপিষ্ঠ মার (৪) নিতান্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, "এই প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহকাল কিছুই ভক্ষণ করে নাই, আজ যদি অনাহারে থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত মারা যাইবে। অতএব শ্রেষ্ঠী যাহাতে উহাকে খাদ্য দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া দুরাত্মা তখনই মায়াবলে বোধিসত্ত্বের গৃহে অশীতি হস্ত বিস্তৃত এক

---

(১) ভিক্ষুদিগের অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়মসমষ্টি। (২) যিনি স্বীয় বলবত্তায় নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন না।

(৩) হিমালয়স্থ হ্রদবিশেষ, হ্রদ হইতে বাঙ্গলা 'দহ' শব্দ আসিয়াছে।

(৪) বৌদ্ধমতে 'মার' সর্ব্ববিধ পাপ প্রবৃত্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিশেষ। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের 'শয়তান'-তুল্য শক্তিশালী। সংস্কৃত ভাষায় কন্দর্পকে 'মার' বলা হয়।

প্রকাণ্ড কূপ আবির্ভাবিত করিয়া উহা প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারে পূর্ণ করিয়া রাখিল। উহা হইতে এমন ভীষণ জ্বালার উৎপত্তি হইল যে বোধ হইল সেখানে অবীচির * আবির্ভাব হইয়াছে। এই কূপ সমাপ্ত হইলে মার আকাশে বসিয়া রহিল।

এদিকে যে ভৃত্য প্রত্যেক-বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র আনিতেছিল সে ঐ কূপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ফিরিলে কেন, বাপু?" সে কহিল, "প্রভু, পথে এক ভয়ঙ্কর জ্বলদঙ্গারপূর্ণ কূপের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার এমন ভীষণ জ্বালা যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।" তাহার পর অন্যান্য ভৃত্যেরাও যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া এত ভয় পাইল যে, তাহারা ছুটিয়া পলায়ন করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, "আজ কূটকর্ম্মা মার আমার দানের অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, শত সহস্র মারেও আমাকে কিরূপে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে। দেখিতে হইবে কাহার ক্ষমতা অধিক—আমার, না মারের।" অনন্তর পার্শ্বে যে অন্নপাত্র ছিল তাহাই হাতে লইয়া তিনি নিজ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপনীত হইলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে তুমি?" "আমি মার।" "তুমিই কি এই প্রজ্বলিত অঙ্গারকুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছ?" "হাঁ, আমিই করিয়াছি।" "কেন করিলে?" "তোমার দানে বাধা দিবার জন্য এবং এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবন-নাশের জন্য।" "আমি তোমাকে দানে বাধা দিতে দিব না, এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবনও নাশ করিতে দিব না। আজ দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে কাহার প্রভাব অধিক—তোমার, না আমার।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব কুণ্ডের ধারেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবান্ প্রত্যেক-বুদ্ধ, এই কুণ্ডের মধ্যে অধঃশিরে পড়িতে হয় তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি আমি ফিরিয়া যাইব না! আমার কেবল এই প্রার্থনা—আপনার জন্য যে

* অবীচি—নরক বিশেষ।

ভোজ্য আনিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন।”

অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> উর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন—
> সেও ভাল, মন যেন তবু নাহি ধায়
> কথন(ও) অনার্য্য-পথে, ত্যজি দানব্রত।
> অতএব দয়া করি লও প্রভু, তুমি
> এই ভক্ষ্য ভোজ্য, যাহা এনেছি যতনে।
> হউক সার্থক আজি দাসের জীবন।

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্নভাণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সেই অঙ্গারের উপর পাদ-বিক্ষেপ করিলেন, অমনি অশীতি হস্ত পরিমিত কুণ্ডের তল হইতে এক অপূর্ব্ব মহাপদ্ম উত্থিত হইল। উহার রেণুরাশি তাঁহার মস্তকোপরি প্রক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণচূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি (সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর) দাঁড়াইয়া প্রত্যেক-বুদ্ধের ভাণ্ডে ভোজ্য ঢালিয়া দিলেন।

প্রত্যেক-বুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভাণ্ডটি আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে স্বয়ং আকাশমার্গে হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমন পথটী নানা আকারযুক্ত মেঘখণ্ড্ভিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মারও পরাস্ত হইয়া ক্ষুণ্নমনে স্বস্থানে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব সেই পদ্মোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সমবেত জনসমূহকে শীলাদি* ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন এবং শেষে সকলকে সঙ্গে লইয়া বাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

---

*শীল—সচ্চরিত্র, চরিত্র রক্ষার উপায়। বৌদ্ধমতে শীল দশটি।

সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুইজন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তর-চরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাদি হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরু ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর্ তর্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই।

সেই সততচঞ্চলা শক্তি কদাচ কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে, কোনও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিক্ষুণ্ণ পথ কল্পনার সৌন্দর্য্যে অনুবিহব ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আখ্যানের যোজনপূর্ব্বক তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কখন কাহারও দাসত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাস-চঞ্চল মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কন্দরের কোণদেশে

কবি কৃত্তিবাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায

ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য উপনিবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ সকলজনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। তাদৃশী ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা, ধমনী, কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে 'আমার' বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস যেমন সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়ের, সকল সময়ের সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় রামায়ণ-কাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী, সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তাহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল বা ভাব সুস্পষ্ট নহে, তাহাদের প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে

সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুইজন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তর-চরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের শুষ্ক ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর্ তর্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই।

সেই সতত-চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে, কোনও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিসৃষ্ট পথ বর্ণনার সৌন্দর্য্যে অল্পবিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ব্বক, তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাস-চঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কন্দরের দেশের

মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া কবিকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বৈরচারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও বা নূতন পথে, যেথানে যেমন ইচ্ছা সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, -ষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষের চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে নিস্তব্ধ নিশীথে রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত বা অনুভূতির বিমল করে ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না। সায়ংকালের শ্যামায়মান বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য-সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই; সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না, সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তদীয় কবিতার কুত্রাপি কোনওরূপ বাধা দেখিতে পাই না, সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয় যেন, এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য-চিন্তা বিরত হইয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই

তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, আচন্দ্রদিবাকর করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোনও প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোনও বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে! তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত আপনাকে মিশাইতে না পার, 'তদ্ভাবভাবিত' করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণ কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিত উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জন-পদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক্ অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত ব্যক্তিও প্রেমভরে রামায়ণ গান করিয়াও আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্ণে ধূসরবসনা বিধবারা সমবেত হইয়া, কোনও ললিত-বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাস-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ভক্তির রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্য্যন্ত

যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পাদপূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব,—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে, বিপণির পর্ণকুটীরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে।

"দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী"

আজ আর সে 'ফুলিয়া' নাই, সে ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের সেই 'চাপিয়া বসতি'র চিহ্নও নাই। কিন্তু সেই 'ফুলিয়া পণ্ডিতের' মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

—(*)—

দুইখানি ছবি

মানকুমারী বসু

একজন চিত্রকর একটি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য বহুদিন হইতে আগ্রহ করিতেছিলেন। একদিন কোন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুকুমার শিশু দেখিতে পাইলেন। তাহার প্রফুল্ল মুখকমল এত সুন্দর, এত পবিত্র এবং এমন মনোহর যে এমন কমনীয় মানব-মুখ চিত্রকর আর কখনও দেখেন নাই।

তখন তিনি মনে করিলেন, আজ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। আমি মনে মনে যাহা কল্পনা করিতেছিলাম, আজ তাহাই পাইয়াছি। ইহা স্থির

করিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে সেই অপূর্ব্ব শিশুর মনের মত করিয়া ছবি আঁকিয়া লইলেন এবং অতি সুন্দররূপে বাঁধাইয়া নিজের বৈঠকখানায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। সেই ভুবনমোহন চিত্র যে দেখিল সে-ই চমৎকৃত হইয়া শতমুখে সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। স্বর্গীয় শান্তি এবং পবিত্রতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই চিত্রে বিরাজমানা। চিত্রকরের যখন কোন কারণে মনে উদ্বেগ বা বিরক্তি জন্মিত, তখনই সেই অপূর্ব্ব ছবিটি একাগ্রচিত্তে সন্দর্শন করিতেন, চিত্রস্থ শিশুর স্বর্গীয় শোভার অনুপম মাধুরীতে তাঁহার সকল অশান্তি বিদূরিত হইত।

কিছুদিন পরে আবার চিত্রকরের ইচ্ছা হইল, এই চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র চিত্রিত করিবেন। যেমন একটি পুণ্যের ছবি দ্বারা গৃহ সুশোভিত করিয়াছেন, তেমনি তাহার পার্শ্বে একটি পাপের ভয়ানক চিত্র রাখিয়া তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিবেন।

অনেক বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি পূর্ণ পাপমূর্ত্তি খুঁজিয়া পাইলেন না; পরিশেষে একদিন কারাগারে উপস্থিত হইয়া ভয়ানক পিশাচরূপী এক মানবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার মুখ যেমন শীর্ণ, তেমনি কদাকার ও পাপাসক্তিপূর্ণ, চক্ষুযুগল যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গণ্ডস্থল যেন পাপকালিমায় কলঙ্কিত। মানুষের আকৃতি যে এরকম পিশাচের মত হইতে পারে ইহা চিত্রকরের কল্পনায়ও কোনদিন উদিত হয় নাই।

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পাপমূর্ত্তি দেখিয়াই চিত্রকর স্থির বুঝিলেন যে ইহার দ্বারাই তাঁহার অভীষ্ট সম্পূর্ণ সফল হইবে। তখন তাহার সেই ভীষণ মুখের এক চিত্র অঙ্কিত করিলেন, সেই ভয়ানক ছবি তাঁহার বৈঠকখানায় সেই শিশুমূর্ত্তির পার্শ্বে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন।

যখন ছবি দুইটি পাশাপাশি স্থাপিত হইল, তখন তাহার পার্থক্য দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল, দেবতা ও অসুরে যতটা প্রভেদ,

স্বর্গ ও নরকে যতটা প্রভেদ, এই পুণ্যমূর্ত্তি শিশু এবং পাপমূর্ত্তি যুবকের চিত্রে ততটা প্রভেদ স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল।

মানবমূর্ত্তি এ প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ কিরূপে হইল, চিত্রকর এই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই ভীমদর্শন কারাবাসীর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একান্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে তিনি যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হায়! যে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক সরল স্বর্গীয় মাধুরীময় শিশুর ছবি তাঁহার নয়ন ও মনের তৃপ্তি, আনন্দের প্রধান উপকরণ, যাহার সৌন্দর্য্য তিনি মানবের আদর্শ সৌন্দর্য্য বলিয়া জানেন সেই অপূর্ব্ব শিশু এবং কদাকার ভয়ানক দর্শন পাপের প্রতিকৃতি স্বরূপ যুবক একই ব্যক্তি। ক্ষোভ, রোষ ও বিস্ময়ে চিত্রকর হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, এ দেবতার অসুরত্ব প্রাপ্তি কিরূপে হইল, কেহ জানিতে চাহ কি? ইহার নিগূঢ় কারণ—একমাত্র কারণ সুরাপান। সেই পদ্মফুল তুল্য নিষ্পাপ বালকটি কুসংসর্গে পতিত হয়। মানব চরিত্র খুঁজিয়া দেখ, যত লোকের অধঃপতন হইতেছে, প্রায়ই কুসংসর্গ তাহার মূল কারণ। সেই হতভাগ্য কুসঙ্গে পড়িয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করে, ক্রমে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অধিকতর দুর্জ্জনদিগের সহবাসে, অধিকতর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, নানা দুষ্কার্য্য করে এবং নিজেও দুর্জ্জন হইয়া উঠে। সেই সকল দুষ্ক্রিয়ার ফলে তাহার কারাবাস ও পাপমূর্ত্তি সংঘটিত হইয়াছে।

যে বিধাতা তাহাকে সেই নিষ্পাপ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দিয়া জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি বুঝি হতভাগ্যের পাপাচরণে ব্যথিত হইয়া ও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অলৌকিক রূপরাশি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে এই পিশাচবৎ কদাকার করিয়া দিলেন। হতভাগা এই শাস্তি লাভ করিল।

মানব! একবার তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ। আজি যাহাকে মহাপাপী বলিয়া শিহরিতেছ, যে হতভাগার চরম দণ্ডপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া চমকিত হইতেছ, যে পাপ রাক্ষসের প্রীত্যর্থ স্বহস্তে কুসুমকোরক তুল্য

শিশু সন্তানকে হত্যা করিয়াছে জানিয়া স্তম্ভিত হইতেছে, সে একদিন নিষ্কলঙ্ক শিশু ছিল, দশজনের মত কত স্নেহ, কত আদর, কত আশা-ভরসার সহিত সেও লালিত হইয়াছিল। হায়! এই চিত্রিত যুবকের মত কুসংসর্গে পড়িয়া পাপের কুহকে তাহার কি সর্ব্বনাশ না হইয়াছে! ভগবান্ তাহাকে যে সকল পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনার্থ জগতে পাঠাইয়াছিলেন, পাপ-প্রলোভনে মজিয়া সে সে-সবই ব্যর্থ করিয়াছে। মানব! এই চিত্র ভাল করিয়া দেখিয়া জীবন-পথে সাবধান হও। ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ কর, চরিত্র রক্ষার্থে প্রাণপণ কর, আত্মসংযম অভ্যাস কর, যেন তোমার জীবন এমন বিষময় না হয়।

পাপী! তুমি যদি পাপের পথে পড়িয়া থাক, আর নহে, ফিরিয়া আইস। পতিত মানবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন বলিয়াই জগদীশ্বরের নাম পতিতপাবন। পাপকে পাপ বলিয়া মনে কর। যদি অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও তবে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, রক্ষা করিবেন। জগতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, কত সংসারের পরিত্যক্ত মহাপাপী দয়াময় বিধাতার দয়া পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তুমি যদি অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার দয়াভিক্ষা কর তবে তুমি তাঁহার দয়া পাইবে। তাঁহার দয়া পাপীকেও প্রত্যাখ্যান করিতে জানে না।

এই দুইখানি ছবি সকলে জ্ঞানচক্ষের সমক্ষে রাখিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হউন।

আত্মনির্ভরশীল বিদ্যাসাগর

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংসারে অন্য দশজনের অনুগ্রহভাজন না হইয়া অন্যের সহায়তা লাভ না করিয়া, জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া অতীব কঠিন কাজ। বিশেষতঃ নিরন্ন দরিদ্র বালকের পক্ষে এরূপ আত্মনির্ভর আরও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। উত্তরকালে বহুবন্ধু পরিবেষ্টিত হইলেও, তিনি একাকী জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার মত গরীব অতি অল্পই হয়। তাঁহার পিতা যে ভাবে দুঃখকষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের পথে তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে সামান্য আয়ে বহু পরিবারের ভরণ-পোষণ সঙ্কুলান হইত না বলিয়া, বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক সময়ে উদরান্নের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। তাঁহার নিজের বর্ণিত দুঃখের কাহিনী যে কত হৃদয়বিদারক, তাহা সহৃদয় লোক কেবল অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম। লেখনী সে দুঃখের বার্ত্তা বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, কখন অন্ন জুটিত, কখন জুটিত না, যখন জুটিত তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জনের অভাবে, কেবল নুণ ভাতে দিনপাত করিতেন, যখন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন, তখন মৎস্যের ঝোল রাঁধিয়া, এক বেলা ভাত আর সেই ব্যঞ্জনের ঝোল খাইয়া, বৈকাল বেলার জন্য তরকারী ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন। পরদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।*

---

* এই অবস্থাবর্ণন আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি।

এইরূপ ক্লেশে পড়িয়া দিবারাত্রি শ্রম করিয়া যে বালক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে প্রাণপণ যত্ন করে, বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে উত্তরকালে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধ্যসাধনের প্রথম অঙ্কুর বিদ্যালয়ে বাল্যসহচরদিগের পরিচর্য্যার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র, নিজে সর্ব্বদা উদরপূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন, সময়ে সময়ে তাহারও কিছু কিছু অন্য সহাধ্যায়ীদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। কাহারও পীড়া হইয়াছে, শুনিবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বাড়ীর চরথা-কাটা সূতায় প্রস্তুত মোটা চটের কাপড় পরিয়া নিজের অর্থে অন্য দরিদ্র বালকদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর পরিধেয় ক্রয় করিয়া দিতেন। বালকের কথা দূরে থাকুক, পরিণত বয়সের সুপ্রবীণ ব্যক্তির পক্ষেও স্বার্থত্যাগের এরূপ আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত লোকসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে তিনি সেই বাল্যকালেই, নিজের দুরবস্থা বিস্মৃত হইয়া অন্যের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। একদিকে অনাহার ও অনিদ্রাজনিত দুঃখকষ্ট, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, অন্যদিকে ইহার উপর গৃহের পাকাদি কার্য্যের ভার তাঁহারই উপর ছিল, আবার তাহার উপরে অপর দশজনের সংবাদ লইয়া ও সেবা করিয়া বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিরূপ বালকের পক্ষে সম্ভব, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। সমগ্র সভ্য জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও, এরূপ দরিদ্র বালকের এ প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধার ভিতরে, এরূপ পরসেবা ও স্বার্থ-ত্যাগের ভিতরে, আত্মোন্নতি-সাধনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একান্ত বিরল—অতি দুর্ল্লভ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

আমাদের সাধারণ লোকের পক্ষে যেটা প্রধান দোষ, প্রতিভাশালী ও

ক্ষমতাবান্ লোকের পক্ষে তাহাই প্রধান গুণে পরিণত হয়। অন্ত লোক নিজের বিস্থাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, নিজের জেদের বশবর্ত্তী হইলে, অপর দশজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে, নিন্দাভাজন হয়, কিন্তু সংসারে কখন কখন দেখা যায় যে, দশজনের বা শতজনের বিদ্যা বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শন একত্র করিলেও প্রতিভাশালী মহাত্মাদের কণামাত্রও হয় না। কাজে কাজেই তাঁহারা নিজের উপর অধিক নির্ভর করিতে শিখিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের ঐরূপ আত্মনির্ভরের ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও সাহায্য না লইয়া, বিস্থালয়ে তিনি সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র হইবেন, সর্ব্বদা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক হইতে যত প্রকার ক্লেশ ভোগ করার প্রয়োজন, তাহাতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সে বিষয়ে কাহারও বাধা মানিতেন না। অনেক সময়ে অর্দ্ধ রজনী, কোন কোন সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করিতেন। এরূপ পরিশ্রমে অনেক সময়ে তিনি কঠিন পীড়ায় অনেক দিন ধরিয়া শয্যাগত থাকিতেন। কিন্তু তথাপি আত্মোন্নতিসাধনে কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্ত বিরত ছিলেন না। উত্তরকালে যখন তিনি সম্মান ও সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তিনি জনসমাজের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের সহিত বড় সংস্রব রাখিতেন না, তখনও দেখা গিয়াছে, একাহারে, অনাহারে বা রুগ্ণ শরীরে সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। কোন নূতন বিষয় জানিবার জন্ত, কোন নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্ত, কোন নূতন পুস্তক ক্রয় করিবার জন্ত, সর্ব্বদা মুক্তভাবে অপেক্ষা করিতেন। কেহ কোন বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে, ইহা তিনি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এই দুর্দ্দমনীয় আত্মোন্নতির স্পৃহা ও আত্মাদরের ভাব তিনি বাল্যকালে বিস্থালয়ে অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শন-লাভাকাঙ্ক্ষায় বহুবার তাঁহার গৃহে

গিয়াছি, কিন্তু কখনও তাঁহাকে চেয়ারে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিতে দেখি নাই। সুস্থতায় কি পীড়ায়, আহারে কি অনাহারে, সকল সময় তিনি সোজা হইয়া বসিতেন, তাঁহার উপবেশনে ক্লান্তিবোধক চিহ্ন কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহার লোকান্তরগমনের পূর্ব্বদিনেও তিনি আপনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি নিজে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোক গমন করেন। ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি সভায় লেখক 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, উদ্ধৃত বিষয়টি তাহারই অংশবিশেষ।]

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবন-দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমাদের মত যাহারা

তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেইজন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ, আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়দের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহার প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র-গঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু পিতা পিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের

সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মসলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরসুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে অনুকরণের দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই, এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিত যে তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই।

—০—

প্রতাপাদিত্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বিক্রমাদিত্য	.	..	যশোহরাধিপতি
প্রতাপাদিত্য	..	...	বিক্রমের পুত্র
গোবিন্দদাস	..	...	বৈষ্ণব
শঙ্কর	...		প্রতাপের সখা
বিজয়া	.	...	যশোহরেশ্বরীর সেবিকা

যশোহর

গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও গোবিন্দদাস

(সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ। হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!—কি কর্‌লে!

বিক্রম। ওরে! এ কিরে! ওরে, এ কাজ কে কর্‌লে রে? ওরে, এ জীবহত্যা কে করলে রে? দোহাই বাবাজী, যেও না।

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ। অধীন আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না। যেস্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণ'বর সেস্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ কি কর্‌লে!

(প্রস্থান)

বিক্রম। ওরে, এ জীবহত্যা কে কর্‌লে রে!—

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ! একি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে কর্‌লে? নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্‌ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি করেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ করবে? এই শুনলুম তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ করছিলে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি করবে কেন?

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হ'য়ে বুঝলুম—আমি হরিনাম জপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে করতে হবে, পররাজ্যলোলুপ দুর্দ্দান্ত শত্রুর আক্রমণ থেকে আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধরতে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তার নয়। শক্তি-অভিমানী যশোর-রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তার কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রুশোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা তাই আমি এই শোণিত-পিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার করেছি।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি করেছি।

বিক্রম। তাইত বলি—তাও কি কখনও হয়? ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখতে প্রতাপ আমার পিতৃ-সম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়েছে। এই শুনলুম তুমি পরম বৈষ্ণব হয়েছ। তুমি এমন কাজ করবে কেন?

প্রতাপ। না পিতা! মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হয়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ! মিথ্যা কথা। এই উড্ডীয়মান বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হয়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ! রাজার সম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার। বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করো না। এ কার্য্য আমি করেছি।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা, আমি করেছি।

শঙ্কর। ভাল, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? সম্মুখেই পাখী পড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কা'র শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হয়েছে, এখনি বুঝ্‌তে পারা যাবে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে আপত্তি কি?

শঙ্কর। ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে, তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা, সুবিচারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটি প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয় তাহ'লে ব্রাহ্মণ হয়েও আমি কায়স্থকুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার করবো। আর আমা হ'তে যদি একার্য্য সাধিত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে প্রতিশ্রুত হও, রাজকুমার, তুমি অবনতমস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করবে?

প্রতাপ। বেশ, প্রতিজ্ঞা করলুম।—কিন্তু ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায়—মীমাংসা হবে কি ক'রে?

শঙ্কর। তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান করেছ?

প্রতাপ। আমি পাখীর পক্ষভেদ করেছি।

শঙ্কর। আর আমি—মস্তক চূর্ণ করেছি।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ করেছি।

বিক্রম। একি! একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! একি হেঁয়ালি! কে তুমি? এ সমস্ত কি, প্রতাপ!

প্রতাপ। তাই ত। একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছুই ত জানি না মহারাজ! এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্ত মাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখনও দেখিনি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। যথার্থই কি এলি মা! দুর্ব্বল-পীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধাভিন্ন অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতর কণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা!

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষিহৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত। কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ। কেন তুমি এই শ্যেন পক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলে?

শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কিনা পরীক্ষা কর্‌ছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দেখ্‌লুম না। হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছিতে পারে কি না।

বিজয়া। আর আমি দেখ্‌লুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ কর্‌ছে। তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার কর্‌বার জন্য একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটি সুখের সংসার শত্রুর অত্যাচারে ছারখার হয়েছিল। তার ফলে একটি ব্রাহ্মণকন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ-অরণ্য-বাসিনী কুমারী, কাঙ্গালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো। প্রতিশোধ-বাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা-আপনি শর ছুটে গেল। পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল। এই নাও প্রতাপ, পক্ষী নাও। এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়-পতাকার চিহ্ন হ'ক। [প্রস্থান

শঙ্কর। একি মা! দেখা দিয়ে যাস্ কোথায়? সর্ব্বনাশি! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন করিস্ কেন?

প্রতাপ। একি মা বিজয়লক্ষ্মী! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা?

শঙ্কর। রাজকুমার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার পদানত।

[[illegible] ও প্রস্থান।

উত্তর-কাশী

রায় জলধর সেন বাহাদুর

ভারতবর্ষে বারাণসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ। কতদিন এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। পুরাণ অবলম্বন করিলে বলিতে হয়, মানব সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে ইহা বর্ত্তমান। যুগান্তর কাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ দিয়া বহু পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাশীর মহিমা এ হিন্দুর দেশে অটল অচলের ন্যায় স্থির এবং প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ-প্রদীপ্ত তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এখনো সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ভক্ত ও সাধক, প্রতিদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে পূতসলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহন পূর্ব্বক যুক্তকরে ও একান্তচিত্তে বিশ্বেশ্বরের চরণ বন্দনা করেন। আবার সন্ধ্যাকালে যখন ধরাতল ধীরে ধীরে অন্ধকারে আবৃত হয়, পশ্চিম আকাশের লোহিত রাগ মলিন হইয়া যায় এবং জাহ্নবীর শান্ত বক্ষে সান্ধ্যতারকার ম্লান জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, তখন শঙ্খ, ঘণ্টা ও দামামা-ধ্বনিতে সমস্ত কাশী জাগ্রত হইয়া উঠে, ধূপ, ধূনা এবং পুষ্পরাশির সুগন্ধে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয় এবং সহস্র সহস্র ভক্তের সুবিমল ভক্তি ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলি দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের মহিমা-দীপ্ত অভয় চরণোদ্দেশে বর্ষিত হয়। তখন বোধ হয়, কোন ভক্তের একবারও মনে হয় না যে, আর একটি দ্বিতীয় কাশী এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের একপ্রান্তে হিমালয়ের সুগভীর প্রশান্ত ক্রোড়ে লুক্কায়িত আছে এবং সেখানেও বিশ্বেশ্বর এক প্রকাণ্ড পাষাণ-মন্দিরে স্বমহিমায় জাগ্রতভাবে অবস্থান করিতেছেন।

এই কাশীর নাম উত্তর-কাশী। স্বনামপ্রসিদ্ধ কাশীর সহিত স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য ইহার নাম উত্তর-কাশী, কি কাশীর বহু উত্তরে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত বলিয়া উত্তর-কাশী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কাহার গৌরব অধিক, তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিশ্বেশ্বরের প্রিয়

পীঠস্থান বলিয়া যদি কাশীর গৌরব হয়, ভগবতী অন্নপূর্ণার লীলাক্ষেত্র বলিয়া যদি কাশী সম্মানিত হইতে পারে, তবে উত্তর-কাশীও আপনার গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিবার উপযুক্ত। উত্তর-কাশী জননী প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত চারু উপবন, শান্তি ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ। হিমালয়ের কোন্ অজ্ঞাত অংশে কৈলাসধাম সংগুপ্ত রহিয়াছে, কে বলিবে? কিন্তু কৈলাসনাথের সেই আনন্দ নিকেতন হইতে উত্তর-কাশী কোনও অংশে ন্যূন নহে।

আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই এই কাশীর নাম-অবগত আছেন; কারণ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই কাশীর উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। তাহার পর ভারতবর্ষের একপ্রান্তে, অতি দুর্গম প্রদেশে এই তীর্থের অবস্থান। সুতরাং নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকের এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য ঘটে। যে সকল গৃহী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থই দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকে এখানে আসিবার আশা ত্যাগ করিতে হয়। হিমাচলের পাদদেশে গাড়োয়াল রাজ্য অবস্থিত, তাহার রাজধানী শ্রীনগর হইতে পাঁচদিন, সুদীর্ঘ বিপৎসঙ্কুল বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অশ্রান্তভাবে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া অবশেষে উত্তর-কাশীতে উপস্থিত হওয়া যায়! না দেখিলে এই পথের ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পর্ব্বতের উপর দিয়াও সরল পথ নাই;—কোন স্থানে বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া উপত্যকার এক অংশ হইতে নিম্নতর অংশে অবরোহণ করিতে হয়, কোথাও পার্ব্বত্য-বৃষ্টির সহায়তায় গভীর উপত্যকা হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে হয়, কিঞ্চিন্মাত্র অসতর্ক হইলেই বোধহয় অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগহ্বরে, কোন্ অতলস্পর্শে পড়িয়া জীবনে সমাহিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব গৃহী দূরের কথা, অনেক সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও সেখানে উপস্থিত হইতে অসমর্থ। শুধু বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই সেখানে যাওয়া যায় না, প্রাণের একান্ত আগ্রহের সঙ্গে দুইখানি মজবুত পদ, একটি সবল দেহ এবং উপযুক্ত আহার সামগ্রী সঙ্গে লইয়া এই মহাতীর্থ-দর্শনের কল্পনা ব্রত

গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য বদরীনারায়ণ ও কেদারনাথ দর্শনার্থী সাধুসন্ন্যাসিগণের অনেকেই গঙ্গোত্রীর পথে আসিতে ভীত ও চিন্তিত হইয়া থাকেন।

উত্তর-কাশী হিমালয়ের নিভৃত বক্ষে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। এখানে আসিবার পূর্ব্বে মনে হয়, বুঝি বারাণসীর আর একটি অভিনব দৃশ্যপট এখানে উন্মুক্ত হইবে। সেই পাষাণসোপানবদ্ধ ভাগীরথীর তীর ও তরণী-শোভিত তটিনীবক্ষ, সহস্র সহস্র নরনারীসঙ্কুল বায়ুপ্রবাহহীন প্রস্তর গৃহ, আবর্জ্জনা-দূষিত পণ্যবীথিকাপূর্ণ সঙ্কীর্ণ রাজপথ এবং সঙ্কীর্ণতর দুর্গন্ধময় শাখাপথ-সমূহ সেইরূপই ইতস্ততঃ প্রসারিত রহিয়াছে,—বুঝি এখানেও কাঁসর ঘণ্টা-মুখরিত অসংখ্য দেবালয় ও দেবপ্রতিমা, সাধু ও অসাধু, মুমুক্ষু ও অর্থলিপ্সু, সাধ্বী ও পতিতার তেমনই বিচিত্র সম্মিলন।

কিন্তু এখানে উপস্থিত হইলে, তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি সুন্দর অপাপবিদ্ধ পুণ্যতীর্থ স্নিগ্ধতায় ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, মধ্যে অনতি বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে উত্তর-কাশী প্রতিষ্ঠিত। সেই পবিত্র পীঠতল প্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রসন্ন-সলিলা কলনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ অসংখ্য উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে। চিরতুষার-মণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি যেন মস্তকে শ্বেত শিরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক শ্যামল তরুরাজিতে মধ্যদেশ আবৃত করিয়া কোন মহাপুরুষের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত অনুসারে এক অরণাতীত যুগ হইতে বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এই দেবভূমিকে রক্ষা করিতেছে। নিদাঘের খর রৌদ্রোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন এবং শীতের তুষার-সমাচ্ছন্ন-কুজ্ঝটিকাময়ী হিমযামিনী—সর্ব্বকালেই এক মধুর প্রশান্তিতে এই পুণ্যভূমি পরিব্যাপ্ত থাকে।

উত্তর-কাশী নগর নহে। নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য, কর্ম্মভার, আশা-নিরাশা ও সাফল্য নিষ্ফলতার সন্ঘর্ষণে উৎপন্ন ঘোর আন্দোলন, আর্ত্ত ও পীড়িতের হৃদয়ভেদী সুক্ষ ক্রন্দনোচ্ছাস, পুরুষকারের বিজয়গর্ব্ব, জেতার দম্ভ এবং আভিজাত্যের অভিমান এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের

ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল কঠিন পর্ব্বতাবরণ ভেদ করিয়া এই শান্তিধামে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে, নীচতার ধূলি এবং হিংসা-দ্বেষ ও ক্রোধ-লোভের জ্বালাময় বায়ুপ্রবাহ এই পবিত্র তীর্থ কলঙ্কিত করে নাই, বিলাসপ্রিয়তা এবং পার্থিব লালসার এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এখানে উপস্থিত হইলে শুধু বহু প্রাচীন, নিষ্কলঙ্ক, মঙ্গল কিরণানুরঞ্জিত শান্ত আর্য্য-জীবনের একটি সুকোমল পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

অধিবাসীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প—এক শত ঘরের কিছু অধিক হইবে। নর-নারী সকলের প্রকৃতিই অতি মহৎ ও সরল। ইহাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই। অতিথির প্রতি ইহাদের অসাধারণ যত্ন ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সম্বল অতি সামান্য, কিঞ্চিৎ অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড ও অল্পসংখ্যক গবাদি পশু। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া ইহারা নিশ্চিন্তভাবে দিনপাত করে। এমন পরিশ্রমী, সহজসন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় জাতি বর্ত্তমান কালে অতি বিরল। পরিশ্রমবলে ইহারা এই কঠিন পার্ব্বত্য-মৃত্তিকাতে শস্যাদির উৎপাদন করে এবং তাহাতেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

এখানকার অধিবাসিবর্গ সকলেই ব্রাহ্মণ, ইঁহাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, প্রকৃতি শান্ত এবং ব্যবহার অতি মধুর। অধিকাংশ লোকই দেবভাষার সহিত সুপরিচিত। ইঁহারা গৌরবর্ণ। মধ্যাহ্নে যাঁহারা হলচালনা করেন প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে তাঁহারাই স্থির-গম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও মহিম্নস্তব পাঠ করিয়া থাকেন।—দেববালার ন্যায় সুন্দরী সুকেশী, আরক্তগণ্ডা, সুলোচনা বালিকাগণ আদিম আর্য্যকন্যার অনুরূপ এখনও গো-দোহন করে এবং কোমল-হৃদয়া স্নেহময়ী রমণীগণ পরম উৎসাহের সহিত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে স্ব স্ব স্বামীর সহায়তা করেন। প্রাচীন কালের এই সকল মোহন দৃশ্য নয়ন সমক্ষে বিমুক্ত দেখিয়া শুধু বিস্ময়-নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। মনে হয়, ইহা কি ঊনবিংশ শতাব্দী এবং পাশ্চাত্যসভ্যতাদীপ্ত ইংরাজের শাসিত

ভারতবর্ষ? অথবা বহু শত বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক যুগের এক সুমধুর, প্রীতি-প্রফুল্ল দৃশ্য, সরস্বতী দৃষদ্বতীর তটভূমি হইতে সঞ্চয় করিয়া কোন ঐন্দ্রজালিক, তাহার মোহিনী মায়ার আশ্চর্য্য প্রভাবে, হিমাচলের এই গোপন অন্তরালে সংগুপ্ত রাখিয়াছে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর সুসভ্য পরিব্রাজকের কৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে একটি অমল-সুন্দর বিভ্রম অতীতের একটি ছায়াসুপ্ত মায়াপুরীর রচনা করিতেছে।

এখানে ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা কিংবা পাষাণময় গৃহ একখানিও নাই। গৃহগুলি সমস্তই পর্ণকুটির—যেন আদিকালের সেই সরল শান্ত ও সুপরিচ্ছন্ন তপোবন! চতুর্দ্দিকে দুই চারিটি অনুচ্চ দেবমন্দির, মধ্যে জাহ্নবীকূলে একটি বহুপুরাতন দৃঢ়কায়, সমুন্নত পাষাণমন্দির, কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং শত ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একটি শুভ্র গিরিশৃঙ্গের ন্যায় এই পর্বতোপত্যকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—অভ্যন্তরে বিশ্বেশ্বরের পাষাণমূর্ত্তি। এই মন্দির ও অভ্যন্তরস্থ প্রতিমা নিরীক্ষণ করিলে একবার কাশীর সেই মন্দির ও তাহার দেবতার কথা মনে হয়। কে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক প্রাচীন বলা যায় না। কাশীর সেই মন্দিরে বাদ্যোদ্যমের তুমুল কলরব, যাজ্ঞিক ও পুরোহিতবর্গের মন্ত্রোচ্চারণস্বর, সমস্ত একত্র হইয়া যে মিশ্রিত ধ্বনির উৎপাদন করে, তাহা শুনিলে মনে হয় বিশ্বেশ্বর নিখিলের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণপূর্ব্বক, রাজেন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার মহাসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন, অনুভব হয়, কুবের তাঁহার ধনাধ্যক্ষ, মৃত্যু তাঁহার কিঙ্কর, মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী,—তিনি প্রার্থীকে ধন দিতেছেন, স্বাস্থ্য দিতেছেন, ভীত ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইতেছে, অশান্ত হৃদয় শান্তিধারা লাভ করিয়া পূর্ণপ্রাণে প্রস্থান করিতেছে এবং সকলে "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। সেই জয়নাদ, সেই প্রীতি ও ভক্তির বিমল উচ্ছাস, সমগ্র ভারতবর্ষে বিকীর্ণ হয় এবং কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের ভক্তগণ অধিক আশ্বস্ত হৃদয়ে অধিক আগ্রহ-সহকারে, এই দেবাদিদেবের চরণমূলে

আপনাদিগের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিবার জন্য বারাণসীধামে উপস্থিত হয়।

কিন্তু উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বর ভিখারী। তাঁহার দর্শকসংখ্যাও নিতান্ত অল্প; স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ ভিন্ন আর যাহারা তাঁহার দর্শন-কামনায় এই পবিত্র পীঠস্থলে সমাগত হয় তাহারা ভিখারী সন্ন্যাসী মাত্র। তাঁহার পূজার জন্য সুবর্ণ-নির্ম্মিত বিল্বপত্র কোথায় পাইবে? স্বর্ণ কলসে তাঁহার মন্দিরচূড়া বিমণ্ডিত করিবার অর্থ তাহাদের কাহারও নাই। কিন্তু সেই অল্পসংখ্যক ভক্তের অকৃত্রিম ভক্তি তাঁহার পাষাণ মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং সেই ভক্তিই যেন দেব-চরণ হইতে সুপবিত্র সুধৌত বেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তদীয় ভক্তের হৃদয়ে বল, সাহস ও মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিতেছে। অর্থগৌরবে কাশীর বিশ্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; কিন্তু উত্তর-কাশীর দরিদ্র ভক্তবৃন্দকে কে পরাস্ত করিবে?

মন্দিরে কোন প্রকার কারুকার্য্য নাই। মন্দিরটি কতকালের তাহাও নিরূপণ করা অসম্ভব। হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অভ্যুত্থানকালে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাশীর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ, অনেক প্রকার উক্তি আছে, বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধেও নানা অলৌকিক আখ্যায়িকার অভাব নাই, কিন্তু উত্তর-কাশীর উৎপত্তি, এই বিশ্বেশ্বর মন্দির ও দেবতার অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না। যে সকল ভক্ত অধিবাসী ও পাণ্ডার হস্তে এই মন্দিরের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা মন্দিরের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এ পর্য্যন্ত স্বকপোলকল্পিত কোন গল্পের সৃষ্টি করেন নাই। ইতিহাস তাঁহাদের নিকট মূক, পরিস্ফুট সত্যের ন্যায় এই মন্দির ও তাহার দেবতা তাঁহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান; যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় অবশ্যম্ভাবী, সেই ইচ্ছাময়ের আবির্ভাব ও অবস্থান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন-কৌতূহল তাঁহাদের মনে স্থান পায় না।

শুনিতে পাওয়া যায়, বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভিন্ন উত্তর-কাশীতে আরও কতক-

গুলি বৃহৎ মন্দির ছিল এবং পাষাণবদ্ধ ঘাটেরও অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সমস্তই ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইয়াছে। মন্দিরের পূজকগণের অবস্থা অতি হীন, কিন্তু তাঁহারা নির্লোভ, যাত্রিগণের নিকট তাঁহারা কিছুই প্রার্থনা করেন না, যাত্রিগণ স্বেচ্ছাক্রমে যাহা দান করে তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। এখানে পাণ্ডাদিগের কোন প্রকার উপদ্রব নাই। প্রায় অধিকাংশ তীর্থেই দেখা যায়, পাণ্ডাগণ দুই পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনার জন্য যাত্রীদিগের অর্থের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এখানে সেরূপ কোন উপসর্গ দেখা যায় না। এখানে দুই চারিটি অন্য দেবতার মন্দির থাকিলেও সে সমস্ত দেবতার পূজা অতি সংক্ষিপ্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি ও প্রীতি, বিল্বপত্র, পুষ্প, চন্দন,—মন এবং বন হইতে তাহা সংগৃহীত হয়, অর্থব্যয় অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে।

এখানে দুই একখানি দোকান আছে, তাহাতে আটা, ডাইল, লবণ এবং লঙ্কা ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। ছাগলের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ইহারা পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, কিন্তু শীতকালে অত্যন্ত শীতে ও তুষারপাতে ইহাদের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

বৈশাখ মাসেই এখানে আসিবার প্রশস্ত সময়। বর্ষাকালে এ পথে পর্য্যটন করা অসম্ভব, তখন গলিত-তুষারধারায় পার্ব্বত্য অধিত্যকা সর্ব্বত্রই জলাকীর্ণ হইয়া যায়, প্রস্রবণসমূহ হইতে প্রবলধারায় জলরাশি নিঃসৃত হইতে থাকে, কঠিন পর্ব্বতগাত্র পিচ্ছিল হওয়াতে তাহা অত্যন্ত দুরারোহ হইয়া উঠে। তাহার পরই দুরন্ত শীতকাল এই গিরিরাজ্য আক্রমণ করে, শুভ্র তুষাররাশিতে সমস্ত প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তদ্দেশীয় অধিবাসিগণকে কুটীরের মধ্যে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হয়।

কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভা অতি মনোহর। এই সময়েও এখানে শীত অতি প্রবল, কিন্তু তাহা অসহ্য নহে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠই এখানকার বসন্তকাল। বৃক্ষে বৃক্ষে বিবিধ পার্ব্বত্য কুসুমস্তবক বিকশিত হইয়া

উঠে, পার্ব্বত্য লতাপুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ-ভার ঢালিয়া দেয় এবং পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে প্রদীপ্ত সূর্য্যের শুভ্র কিরণ এই সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভাগীরথী-প্রবাহে, প্রস্রবণসলিলে এবং পুষ্পদলে অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে ; মনে হয়, কঠিন গিরিশৃঙ্গ হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত নীল, আলোকস্ফুরিত আকাশ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের বিপুল মহিমায় উদ্ভাসিত।

উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের একটি সান্ধ্য-আরতির বর্ণনা দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রায় অবসানকাল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছেন, অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। পার্ব্বত্য কৃষককুটীরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অদূরে নদীতীরে বৃক্ষশ্রেণী, অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী ও অবধূত সেই শালবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া তাঁহারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সান্ধ্য-উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেই গভীর শব্দ দূর হইতে দূরান্তরে পর্ব্বতে শিখরে শিখরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ ধীরে ধীরে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই সেখানে সম্মিলিত দেখা গেল। সমবেত নরনারীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ,—সেই ক্ষুদ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ তাহাতেই পরিপূর্ণপ্রায়।

পূজা শেষ হইলে দেবতার আরতি আরম্ভ হইল। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটি অজাতশ্মশ্রু বালক দীপাধার হস্তে লইয়া আরতি আরম্ভ করিল। বালকের আকৃতি ও প্রকৃতি অতি সুন্দর। মুখমণ্ডল প্রশান্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, কার্য্যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা প্রতিফলিত। এত অল্প বয়সে এমন গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা শুধু সেই জাতির মধ্যেই সম্ভব, যাহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভক্তি ও সংযম।

ধূপ-দীপহস্তে আরতি করিতে করিতে বালক যে পবিত্র সামগাথা গান করিতেছিল, সেই গানের ও গায়কের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য দর্শকবৃন্দের শ্রবণপথে সুধাবৃষ্টি করিতেছিল। সামগান সাধারণতঃই মধুর ও গম্ভীর, বালকের কোমল কণ্ঠে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়া তাহা অনির্ব্বচনীয়, শুধু অনুভবের যোগ্য। যাহারা সেই দেব-সঙ্গীত বুঝিতে পারিল তাহাদের চক্ষুপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল, যাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহারা ছলছলনেত্রে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই অমর-গাথা,—প্রাচীন ঋষি হৃদয়ের সেই অপার্থিব ভক্তি-ইতিহাস শুনিতে শুনিতে পৃথিবীর কথা ভুলিয়া যাইতে হয় এবং অনন্তসুন্দরের দিব্য প্রসন্নতায় বক্ষ ভরিয়া উঠে।

আরতি শেষ হইলে সকলে অবনত-মস্তকে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অধিক রাত্রে চন্দ্র মধ্যাকাশে আসিলে, তাহার বিমল কিরণধারায় ভাগীরথী-জল, নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজি, সুবৃহৎ মন্দির ও প্রত্যেক ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর স্নাত হইতে লাগিল। সেই সময়ে নদীতীরে প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিলে দেখা যায়, বৃক্ষরাজির ঘুমন্ত ছায়া প্রবাহিণীর নির্ম্মল জলে ভাসমান রহিয়াছে, কখন বা মৃদু নৈশ বায়ুর হিল্লোলে একটি শুষ্ক পত্র নদীবক্ষে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, নদীতীরস্থ নানাবর্ণের উপলখণ্ডে প্রতিফলিত চন্দ্ররশ্মি ভাগীরথীতীরকে মন্দাকিনীর মরকত-দীপ্ত উপকূল বলিয়া বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে এবং বিবিধ পুষ্পের সুবাস বায়ুস্রোতে ভাসিয়া এই ক্ষুদ্র নিভৃত উপত্যকাটিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, বোধ হয়, ঐ সুদূর চন্দ্রালোকের সঙ্গে এই মৃদু গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, যেন বিশ্বেশ্বরের পূজার জন্য ইশা প্রকৃতি-হস্ত-প্রেরিত অপার্থিব প্রীতি উপহার। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হয়, চতুর্দ্দিক্ ততই স্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব ধারণ করে, পর্ব্বতশ্রেণীকেও নিদ্রিতের ন্যায় বোধ হয়,—শুধু সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে, হিমাচলের সেই স্নেহালিঙ্গনপাশে, উন্মুক্ত, প্রশান্ত নীলাম্বর-তলে একটি উন্নত মন্দির, বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন একটি গিরিতরঙ্গিণী, নীহারসিক্ত

পুষ্পবন কতকগুলি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও অস্বচ্ছ দেবালয়, একখানি সুচারু দৃশ্যপটের ন্যায় বিস্তীর্ণ থাকে। নিদ্রালস-নেত্রে তাহার দিকে চাহিলে মনে হয়, এ কি স্বপ্নদৃশ্য,—না সত্যসত্যই প্রকৃতিদেবীর স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রকৌশল?

—()—

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনের পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'সাধনায়' দীর্ঘ যে প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করেন, উদ্ধৃত প্রসঙ্গটি তাহারই অংশবিশেষ।]

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলান কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোর কালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম, সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম, সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্যমিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহ-মিলন—তাহার পর হইতে গম্ভীরভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের শৈশব স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্য-পথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সে দিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপ হওয়াই আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন

রায় স্বহস্তে তাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথ-প্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্ স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজী পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্বতন এন্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা গ্রন্থ [illegible] করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীনমলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য

কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানব-জীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন, তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখনকার তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজীতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজী সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন-

সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাব প্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছুই নাই, তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক

অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজেই অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্বে অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আপনার ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করিতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি

খোকাবাবু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ী প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ী। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যাম চিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক জাতিতে কায়স্থ, তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসরবয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালনকার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে, • • • • অনুকূলের একটি পুত্র-সন্তান অল্প দিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে এবং রাইচরণ কেবলি নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলকটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত, এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য-কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য্য

ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্বে সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড় হ'লে জজ্ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর কোনো মানব-সন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পাবে, তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এবং যখন মাকে 'মা', পিসিকে 'পিচি', রাইচরণকে 'চন্ন' বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাকে 'মা' বলে, পিসিকে 'পিসি' বলে, কিন্তু আমাকে বলে 'চন্ন'। বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কি করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনই এরূপ অলোক-সামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার পক্ষে জজের পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত, আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্ত্তী এক জিলায় বদলী হইলেন।

অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলা গাড়ী লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপী, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ী করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল।

পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ ও জলের গর্জ্জনে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাই-চরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ী ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই। মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারের জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চ শাখায় গুটিকতক কদম্ব ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ী বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেইদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে 'চন্ন'র প্রবৃত্তি হইল না। তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো, ও-ই দেখো, পাখী ঐই উড়ে গেল। আয়রে পাখী আয় আয়!!"—অবিশ্রান্ত এই বিচিত্র কলরব করিতে করিতে গাড়ী সবেগে ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ্‌ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা। বিশেষতঃ চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়ীতে ব'সে থাক, আমি চট্ ক'রে ফুল তু'লে আনছি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া সে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানব-শিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ী হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া সে জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল, দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্য মুখে গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল কেহই নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎ-সংসার মলিন, বিবর্ণ ধোঁয়ার মত হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মী, দাদাবাবু আমার"

কিন্তু 'চন্ন' বলিয়া কেহই উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না, কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল; যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন,

লণ্ঠন-হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময়, "বাবু, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মা-ঠাকুরুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে "জানিনে মা"।

যদিও সকলে মনে মনে বুঝিল, পদ্মারই এই কাজ তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে, তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না এবং মাতাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহও উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে, এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে, তুই যত টাকা চাস্ তোকে দেবো :" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের উপর এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কি উদ্দেশ্যে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন, "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল; মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্র-সুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত, তবে এই শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশীদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুকে চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর, হাস্য-ক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মত। এক একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিলেন ফেল্‌না। ফেল্‌না যথা সময়ে পিসিকে 'পিচি' বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমতঃ, যাইবার অনতিবিলম্বে ইহার জন্ম। দ্বিতীয়তঃ, এত কাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ-ও হামাগুড়ি দেয়, টলমল করিয়া চলে এবং পিসিকে 'পিচি' বলে! যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ্ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্ত্তিয়াছে।

তখন মা-ঠাকুরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল, আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।" তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল, জরির টুপি আনিল, মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারী হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না, রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল, পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস

করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের সময় হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতা লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিত না, মনে মনে বলিত, "বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।"

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শোনে ভাল এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী ও সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মত মনে করিতে পারিত না। কারণ রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল এবং তাহার আর একটা দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সে কৌতুকালাপে যোগ দিত না, তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় সে বার্ধক্যের ওজর মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসন-ভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুকে চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর, হাস্য-ক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মত। এক একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিলেন ফেল্‌না। ফেল্‌না যথা সময়ে পিসিকে 'পিচি' বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমতঃ, যাইবার অনতিবিলম্বে ইহার জন্ম। দ্বিতীয়তঃ, এত কাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ-ও হামাগুড়ি দেয়, টলমল করিয়া চলে এবং পিসিকে 'পিচি' বলে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ্ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্ত্তিয়াছে।

তখন মা-ঠাকুরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল, আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে!" তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল, জরির টুপি আনিল, মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারী হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না, রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল, পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস

করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের সময় হইল তখন রাইচরণ নিজের জোত-জমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতা লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিত না, মনে মনে বলিত, "বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।"

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শোনে ভাল এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী ও সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মত মনে করিতে পারিত না। কারণ রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল এবং তাহার আর একটী দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সে কৌতুকালাপে যোগ দিত না, তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় সে বার্দ্ধক্যের ওজর মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসন-ভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মত দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া সে বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন বারাসতে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান নাই, গৃহিণী তখনও সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে পালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান-কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—"জয় হোক্ মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রে?"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন করিলেন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মা-ঠাকুরুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মা-ঠাকুরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—"

অনুকূল বলিয়া উঠিল, "বলিস্ কিরে! কোথায় সে?"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী-পুরুষে দুইজনে

উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন, কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা, আকার-প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল—"এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান্ জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন, এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনি হউক, বিশ্বাস করাই ভাল। তা ছাড়া, রাইচরণ, এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?

ছেলেটির সহিত কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনও তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহের ভাব দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যাইব?"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা থাক্! আমার বাছার কল্যাণ হউক! ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে, উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু!"

"তবে কে?"

"আমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

ফেল্না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ কর। বাড়ীতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দু'টি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্ত-বিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি একপ্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশে পাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু, পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কহিল—"কিরে, শ্রীকান্ত, ভয় করে?"

আমি বলিলাম, "নাঃ—"

ইন্দ্র খুসি হইয়া কহিল, "এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের!"

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটি ছোট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জ্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সে-ও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এমনি শ্রান্ত অথচ বিরাম নাই বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না, বাড়েও না—থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক একবার ঝুপ্ঝাপ্ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শুনা যায়?" সে নৌকার মুখটা সোজা করিয়া দিয়া কহিল, "জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?"

"সে ভয়ানক স্রোত। ও., তাইত কালো জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়্‌লে ডিঙিশুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টান্‌তে পারিস্?"

"পারি।"

"তবে টান্।"

আমি টানিতে সুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, "ঐই—ঐই যে কালো মত বাঁ দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্য দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।"

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, "তবে, ওর ভিতর দিয়ে না-ই গেলে!" ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, "আর ত পথ নেই। এর মধ্য দিয়ে

যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁ-দিকে স্রোত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে? ফিরে আস্তে পারা যাবে কিন্তু যাওয়া যাবে না।"

"তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই" বলিয়া আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চকের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছ্লাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তবে এলি কেন? চল্—তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ!" তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুসি হইয়া বলিল, "এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারি পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মকাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এম্নি বার করে' নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না।" একটু হাসিয়া কহিল, "আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ্ শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে—কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেল্লে ব'লে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস্ গিয়ে ভেসে উঠ্লেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখ্বার যোটি নেই—তারপর মজা ক'রে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোর বেলায় সাঁতারে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্! কি কর্বে ব্যাটারা?"

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম, কহিলাম, "সতুয়ার চড়া ত ঘোর নালার সম্মুখে, সে ত অনেক দূর!" ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "কোথায় অনেক দূর? ৬।৭ ক্রোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হয়ে থাকলেই হল—তা ছাড়া মড়া পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখ্তে পাবি।"

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছুই রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন নিশীথে আবর্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জল-প্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে একদিকে তীরে উঠিবার যো নাই। দশ পনের হাত খাড়া উঁচু বালির

পাড় মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙ্গন ধরিয়া জলস্রোত অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?"

ইন্দ্র কহিল, "সেদিন ত আমি ঠিক এম্‌নি করেই পালিয়েছিলাম। তার পর দিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম—বল্‌লাম নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।'

তবে, এ সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য। ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে। মিট্‌মিট্‌ আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্ত্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সে স্থানটায় জলের বেগ অনেকগুলা মোহানার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছ একটা হইতে অপরটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলি অনেকটা দূরে কাল কাল ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিক অগ্রসর হইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছান গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এস্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দ্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই কাতলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া এদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই কাতলা গোটা পাঁচ ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাট্‌কায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছ-তাড়নায়

ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

"এত মাছ কি হবে ভাই?"

"কাজ আছে। আর না, পালাই চল।" বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই তিন দ্রুতবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমক মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি পরিবর্ত্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি? কি হ'ল?" ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, "চুপ্। শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসছে—ঐ দ্যাখ্।" তাইত বটে! প্রবল জল-তাড়নার ছপাছপ্ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়ে বদ্ধ, সুমুখে ইহারা, পালাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টাক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

'কি হবে ভাই?' বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্ব্বে পাঁচ ছয় দিন ইন্দ্র চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, "ভয় নাই।' কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে ঢুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহারই উপর ৮।১০ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং কশাড়ের গাছ, ভিতরে এমনি ঘোর।

কোথাও এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কাণে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, "ইন্দ্র!" হাত পাঁচ ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, "আমি নীচে।"

"নীচে কেন?"

"ডিঙি টেনে বার কর্‌তে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।"

"টেনে কোথায় বার কর্‌বে?"

"ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়্‌ব।"

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে কেনেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট্ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওকি ভাই?" সে উত্তর দিল, "চাষীরা মাচার উপর ব'সে বুনো শূয়ার তাড়াচ্ছে।"

"বুনো শূয়ার! কোথায় সে?" ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্য-ভরে কহিল, "আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বল্‌ব! আছেই কোথাও এইখানে।" জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম কা'র মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া, কিন্তু ঐ লোকটি এক বুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার উপায় পর্য্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনের এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায় দেখিতেছি, কাছাকাছি এক একটা জনার বা ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া

শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। শঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়োর না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, "ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে।"

কিছু না—সাপ। শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম, অস্ফুট কহিলাম, "কি সাপ, ভাই?"

ইন্দ্র কহিল, "সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরা, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখছিস্ নে?"

সে ত দেখছি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল "কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরছে—দুটো তিনটে ত আমার গা-ঘেঁসে পালাল। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করবো। মরতে একদিন ত হবেই ভাই।"—এম্‌নি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কাণে কতক পৌঁছিল কতক পৌঁছিল না! আমি নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাং করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে।

কিন্তু সে যা-ই হোক্, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কা'র সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি। যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না? বুকখানা কি পাথর দিয়ে তৈরী? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ,

করিয়াছিল, সে দয়া-মায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ সমস্ত বিপদের বার্ত্তা তন্ন-তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—"শ্রীকান্ত, তুই একবার নেবে যা।" সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানিতে পারিত। এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল, "মরিতে একদিন ত হবেই", এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্ব্বত-বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না দুটো চোখে পড়িয়াছে—কিন্তু, এত বড় মহাপ্রাণ আর কখনও দেখিতে পাই নাই।

কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা! এই অদ্ভুত পার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মর্ন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান্! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি। কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজি পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে? যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর

কল্লোল নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিলাম। অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ—যাহাকে অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার যাইতে পারে না—তাহা প্রবাহিত হইতেছে।

বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, "আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েছি।" মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে তোমার ভয় আছে, তা'ও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল। কারণ যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বন ঝাউ এবং ভুট্টা জনারের চড়া ডানদিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১]

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁহার চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার,—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর-মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুণ তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার আঁচলে বেগুণ বাঁধা,—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান, সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই

কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর-মা ছোট জাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মিলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া এক বিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনি সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো,—আমাকেও আশীর্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়। স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন,—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ,—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর-মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে,—মুখ তাহার চিনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময় একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে। হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ,—বামুন-মা ওই রথে চ'ড়ে সগ্যে যাচ্ছে।

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

[১]

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁহার চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার,— এ যেন বড বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আব একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুণ তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার আঁচলে বেগুণ বাঁধা,—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান, সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই

কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর-মা ছোট জাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মিলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া এক বিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনি সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো,—আমাকেও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন,—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ,—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর-মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে,—মুখ তাহার চিনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাহার সিন্দুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময় একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্‌ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো 'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ বাবা,—বামুন-মা ওই রথে চ'ড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১]

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁহার চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার,—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর-মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা,—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান, সেখানে পূর্ব্বাহ্ণেই

কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর-মা ছোট জাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মিলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া এক বিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনি সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো,—আমাকেও আশীর্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন,—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ,—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর-মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে,—মুখ তাহার চিনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাহার সিন্দুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময় একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো 'খন রে। হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ বাবা,—বামুন-মা ওই রথে চ'ড়ে সগ্যে যাচ্ছে।

ছেলে। বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্। ও ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে, তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর-মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল কাঁদ্‌ব কিসের জন্যে রে,—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়।

হাঃ ধোঁ লেগেছে বই ত না। তুই কাঁদ্‌তেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

[২]

সন্তানের নামকরণ কালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙাল জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইয়া বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলিনে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুণ রথে ক'রে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চ'ড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে ব'সে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে।

সবাই দেখলে?

সবাই দেখ্‌লে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এত বড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা' হলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙ্‌লার মা'র মত সতী লক্ষ্মী আর দুলেপাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে কর্‌তে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে কর্‌তে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে কর্‌লে আমি কোথায় থাক্‌তুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিন কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ, সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা' হলে দেবে না মা।

না দিগ্‌গে,—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর অনুরোধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা' হলে। রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র,—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়,—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই,—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে, সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি। তার আকাশ জোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার।

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বল্‌তে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোট জাত বটে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না কর্‌তে পারবে না। দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। ইস্‌! ছেলের হাতের আগুন,—রথকে যে আস্‌তেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌নে মা, বলিস্‌নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধ'রে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধুলো আমায় দিয়ে আমায় বিদায় দেয়। অম্‌নি পায়ে আল্‌তা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

[৩]

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশী নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটি করিল, হাতে পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু, আদার সত্ব, তুলসী পাতার রস,—কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্‌দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ্ ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোব্‌রেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভাল হব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলিনে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না,—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সম্মুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে ও-পাড়ায় যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে ?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা ?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল—গিয়ে বলবি—মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধূলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্‌, বাবা, বলিস্‌ মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার সময় অম্‌নি নাপ্‌তে বউদি'র কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস্‌ কাঙালী, আমার নাম কর্‌লেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এত রকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতেই কাঁপিতে কাঁপিতে যাত্রা করিল।

[৪]

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই, মুখের 'পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্‌ অজানা দেশে চলিয়া গেছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে,—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথযাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দি পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ-খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা কহিল, এমন সতী-লক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে এ আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন। এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা,—কাঙালীর হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়,—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইল, শালা, এ কি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ এ যে আমার মায়ের হাতের পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে, বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে ?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা ?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল—গিয়ে বলবি—মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধূলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্‌, বাবা, বলিস্‌ মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার সময় অম্‌নি নাপ্‌তে বউদি'র কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস্‌ কাঙালী, আমার নাম কর্‌লেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এত রকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

[৪]

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই, মুখের 'পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্‌ অজানা দেশে চলিয়া গেছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে,—পায়ের ধুলো নেবে যে।

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথযাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দি পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। সে ঘাড় নাড়িল, বলিল—না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্‌গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়,—পাজি, হতভাগা নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠনের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতের পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত।

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন যে সে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরী তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে রেখে দে,—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন,—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস

অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাত ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইল এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন, গ্রামে তাঁহার একটা কাছারী আছে। গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অত বড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাংলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল,—আমার মা মরেচে—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবর জল ছড়িয়ে দে। কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে। তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। সে ঘাড় নাড়িল, বলিল—না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্‌গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়,—পাজি, হতভাগা নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠনের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতের পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত।

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন যে সে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকুরী তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে রেখে দে,—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন,—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস

নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুর মশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তোমাকে আগুন দিতে।

তা' দিগে না।

কাছারীর ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়—এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন শোন্ আব্দার, আমারই কত কাঠের দরকার,—কাল বাদে পরশু কাজ! যা, যা, এখানে কিছু হবে না,—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মশায় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে মড়া পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কাণ খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্‌ছেন, ভট্‌চায মশায় সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত,—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধূঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুনার ও চুনারদুর্গ

নিখিলনাথ রায়

ত্রিবেণীসঙ্গম অতিক্রম করিয়া পতিত-পাবনী জাহ্নবী স্ফীত কলেবরে তীর্থরাজী বারাণসী অভিমুখে প্রবাহিত হইল, পথিমধ্যে বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী তাঁহাকে বাধাপ্রদানে উদ্যত হইয়া থাকে। জাহ্নবীর খরতর বেগ সে বাধা উপেক্ষা করিয়া, একটি নাত্যুচ্চ শৈলতলে আসিয়া নিপতিত হয়; সেই শৈলটি 'চরণাদ্রি' নামে উত্তর ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। চরণাদ্রি হইতে তৎপাদস্থিত নগরটির নাম 'চনার' বা 'চুনার' হইয়াছে। চুনার ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ থাকিয়া, আজিও পুরাতত্ত্বপ্রিয় জনগণের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাকে। কেবল তাহা বলিয়া নহে, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও এরূপ প্রীতিপ্রদ যে, তাহা দর্শনমাত্রেই মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যকর বলিয়াও চুনার ও তৎসমীপস্থ স্থানসমূহ চিরপ্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার প্রস্তরের সাধ্য ইহাকে সুবিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি স্বাস্থ্যকরতায়, কি ঐতিহাসিক তথ্যে এবং কি প্রস্তরের কার্যে চুনার যে উত্তর ভারতবর্ষ মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও গৌরবে যে চুনার মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, সে কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

চরণাদ্রি ও অন্যান্য শৈলমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, চুনারকে কিয়ৎ-পরিমাণে পার্ব্বত্যপ্রদেশ করিয়া তুলিলেও, ইহার সমতলক্ষেত্র যে অতীব প্রীতিপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চুনারের প্রান্তরবাসিনী গঙ্গাদেবী ইহাকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন, চরণাদ্রির পাদদেশে আঘাত করিতে করিতে গঙ্গোর্ম্মিমালা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় তাহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। গঙ্গার তীরবর্ত্তী হরিৎ শস্যক্ষেত্রসমূহ নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে। অনেক বৃত্তিভোগী সাহেব-সন্তান চুনারে কৃষি-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে ইউরোপীয় পল্লীতুল্য করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভবনগুলি সকলের হৃদয়েই আনন্দসঞ্চার করিয়া থাকে। ইউরোপীয় পল্লীর নিবিড় বৃক্ষ-সমাচ্ছাদিত রাজপথ চুনারের একটি দর্শনীয় পদার্থ। ইহার নদীতীরবর্ত্তী ও অন্যান্য পথের পার্শ্বে অবস্থিত বিশাল নিম্ব, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি ছায়াপ্রদানে সমগ্র চুনারকে সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। নদীতীরবর্ত্তী নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ বাঙ্গালাগুলি অতীব মনোহর। সর্ব্বাপেক্ষা চুনারদুর্গ ইহার অপরিসীম শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। চরণাদ্রির মস্তকে স্বীয় বিশাল কলেবর স্থাপনপূর্ব্বক চুনারদুর্গ গঙ্গাবক্ষে আপনার ছায়াপাত করিয়া গাম্ভীর্য্য ও রমণীয়ভাব অপূর্ব্ব- মিলন প্রদর্শন করিতেছে। কি নদীপথে, কি রেলপথে, যেদিক্ দিয়া গমন কর না কেন, চুনারদুর্গ সকলেরই নয়নপথে নিপতিত হইবে। এই দুর্গতলে একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী কোন নির্জ্জন পর্ব্বত-গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাবক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গঙ্গা এবং ক্ষুদ্র গিরিনদীটি যেন দুর্গের পরিখারূপে বিরাজ করিতেছে। ফলতঃ চুনারের প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পর্ব্বত ও নদীর সম্মিলনে ইহার স্বাস্থ্যও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গা, নির্ঝর ও কূপের বিমল সলিল নানা রোগের বিনাশসাধন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে অসংখ্য নিম্ববৃক্ষ অবস্থিত থাকায়, তৎসংলগ্ন বায়ুপ্রবাহে শরীর সুস্থ হইয়া উঠে, গঙ্গাসলিলচুম্বী সমীরণ যে শরীরে স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে,

সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। চুনারের সুন্দর অবস্থানের জন্য ইহা দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় জাতিরই স্বাস্থ্য-নিবাসরূপে বিরাজ করিতেছে। সৈনিক বিভাগের বৃত্তিভোগী অনেক সাহেব-সন্তান চুনারে অবস্থিতি করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন, অনেক বাঙ্গালী স্বাস্থ্যলাভের জন্য চুনারে গমন করিয়া থাকেন।

পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যও চুনার চিরপ্রসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানের অনেক কীর্ত্তি এখনও চুনারকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। চুনারদুর্গের সহিত যে কত ঐতিহাসিক তথ্য জড়িত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। চুনার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সময় হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে; বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি অন্যান্য হিন্দুরাজার সহিতও চুনারের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বল্লভাচার্য্যও ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে ইহা যে উত্তর ভারতবর্ষ মধ্যে একটি প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুতুব্‌উদ্দীন, বলবন্, মহম্মদ তোগলক, সেকেন্দর লোদী, বাবর, হুমায়ুন, শেরসাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব, ফররুখশিয়র প্রভৃতির সহিতও ইহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনাকালেও চুনার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সহিত চুনার বিশেষরূপেই সম্বদ্ধ।

ফলতঃ পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য চুনার যে ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট আদরণীয় তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত চুনার প্রস্তরের শিল্পকার্য্যের জন্য যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। যদি কেহ চুনারে উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে [illegible] তাঁহার [illegible] হইয়া উঠিবে। কিন্তু তিনি যখন সুদৃঢ় লৌহকাঠাদির দ্বারা বিরাট প্রস্তরখণ্ডের স্তম্ভ, মিনার, জালি ও টালি প্রভৃতির পারিপাট্য দেখিবেন তখন তিনি যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিবেন,

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চুনারের প্রস্তর-নির্ম্মিত অনেক দ্রব্যই বহুদূরদেশে রেলপথে ও নৌকাযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কাশীধামে যে সমস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত ভবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই চুনার প্রস্তরে গঠিত। চুনারের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি যে ভারতীয় শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রস্তরের শিল্পকার্য্য ব্যতীত চুনারে সুন্দর সুন্দর মৃদ্দ্রব্যও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

গঙ্গা-সলিল-বিধৌত চরণাদ্রি আপনার সুদৃঢ় কলেবরকে অক্ষত রাখিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে। জাহ্নবীর উত্তাল তরঙ্গমালা তাহার গাত্রে আঘাত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পড়িতেছে। নিজের এইরূপ সুদূর সুন্দর অবস্থানের জন্য চরণাদ্রিকে স্বীয় মস্তকে একটি ভার বহন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, সেই ভারটিই চুনারদুর্গ। বাস্তবিক চরণাদ্রির অবস্থানের জন্যই তাহাতে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন করা হইয়াছে। চরণাদ্রিকে পণ্ডিতেরা বিন্ধ্যশৈলশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কারণ, বিন্ধ্যাচলের কঠিন অঙ্গের ন্যায় চরণাদ্রিও সুদৃঢ়। বিশেষতঃ তাহার পাদদেশ গঙ্গোর্ম্মি দ্বারা আহত হওয়ায় চরণাদ্রি আরও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং চরণাদ্রির মস্তকে অবস্থিত দুর্গ যে কিরূপ দুর্ভেদ্য, তাহা বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই পর্ব্বততলে একটি গিরিনদীও প্রবাহিত হইতেছে, তাহা জর্গো নামে প্রসিদ্ধ। উত্তরপার্শ্বে গঙ্গা ও দক্ষিণপার্শ্বে জর্গো নদী অবস্থিত থাকায়, চুনারদুর্গ যে অজেয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এক কথায় উক্ত নদী দুইটিকে দুর্গের প্রাকৃতিক পরিখা বলা যাইতে পারে। এই দুইটি পরিখা অতিক্রম করিয়া চরণাদ্রির মস্তকে আরোহণ করা যে কতদূর কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, সুতরাং চুনারদুর্গ সহজে জয় করার কিছুমাত্র উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত দুর্গের চতুর্দ্দিক্ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে বুরুজ স্থাপন করিয়া তাহাকে আরও ভীতিপ্রদ করা হইয়াছে। দুর্গের এইরূপ অবস্থানের জন্য তাহা হিন্দু, মুসলমান

ও বৃটিশ রাজত্বকালের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

চুনারদুর্গ চরণাদ্রির সমগ্র কলেবরকেই অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে, এজন্য চরণাদ্রির ন্যায় তাহারও চরণাকার ঘটিয়াছে, দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি গুল্‌ফাকার পর্ব্বতকোণে হওয়ায় তাহাও গুল্‌ফাকার ধারণ করিয়াছে; দুর্গটি ক্রমে উত্তরাভিমুখে চরণের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছে। চরণাদ্রির মস্তক অধিকার করিয়া শ্বেত-লোহিত সৌধমণ্ডিত চুনারদুর্গ বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গঙ্গাবক্ষ হইতে ইহার রমণীয়তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; জাহ্নবীবক্ষে ভাসমানা তরণী আরোহণে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি চুনারদুর্গ দেখিতে অতীব রমণীয় বলিয়াই বোধ হয়। রেলপথেও চুনারদুর্গ সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। নদীপ্রান্ত হইতে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রায় ৭০ হস্ত উচ্চ; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে দুর্গটি আরও উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, সে দিকে ইহার উচ্চতা ৯৬ হস্তের কম নহে। দুর্গ-প্রাচীর চৌদ্দ পনর হস্ত হইতে বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ। প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ-প্রাঙ্গণের পরিমাণ-দৈর্ঘ্যে ৮৮ হস্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিসর প্রায় ১২০ হস্ত হইবে। দুর্গের পরিধি ৯২৫ হস্ত অপেক্ষা ন্যূন নহে।

দক্ষালয়ে সতী

দীনেশচন্দ্র সেন

[শিবদ্বেষী দক্ষ শিবকে অপমানিত করিবার জন্য এক বৃহৎ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই যজ্ঞে তিনি তাঁর কন্যা সতী ও শিব, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই, সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতার বাড়ীতে আসিয়াছেন এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] তিনি [illegible], [illegible]

সতী দক্ষালয়ে আসিতেছেন। আসিবার সময় উৎসাহে মহাদেবকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৈলাসের অভ্রংলিহ চূড়া যখন নেত্রপথ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন ধ্যানস্থ শিবমূর্ত্তি কেবলই সতীর মনে পড়িতে লাগিল এবং কেন যে তাঁহার এমন ভ্রান্তি হইল, তজ্জন্য অনুতাপ হইতে লাগিল।

সিংহ উল্কার মত আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছে। পিনাকপাণির বিরাট্ শূলহস্তে ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রূর-কটাক্ষ নন্দীবর পশ্চাতে আসিতেছেন। দেবীর কপালে সিন্দূরবিন্দু, কেশরাজি নিবিড় আগুল্ফলম্বিত, তাহা সিংহের পৃষ্ঠ বহিয়া পড়িয়াছে—যেন নিবিড় মেঘপংক্তি ভেদ করিয়া উল্কা ছুটিতেছে। রুদ্রাক্ষের মাল্য ত্রিগুণিত হইয়া দেবীর বক্ষে লম্বিত, কর্ণে কুণ্ডল,—দেবী বল্কলবসনা, অক্ষ-বলয়া, ললাটের উর্দ্ধে কেশকলাপে বিল্বদল ও জবাকুসুম আবদ্ধ, শ্বেতচন্দনে ললাট দীপ্ত, কপালে অলকাতিলকার পরিবর্ত্তে বিভূতি। একি অপরূপ বেশ! নন্দিকেশ্বর কুবেরকে আহ্বান করিয়া দেবীর রাজরাজেশ্বরীযোগ্য মণিখচিত পরিচ্ছদ আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন, দেবী তাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি যোগীর স্ত্রী যোগিনী, তপস্বিনীর বেশেই তিনি পরিতৃপ্তা, অন্য বেশ তাঁহার প্রীতিকর নহে।

এই বেশে দেবী আসিতেছেন। হীরামণিখচিত পট্টাম্বরধারিণী যে সতীকে প্রসূতি সাজাইয়া হরকে প্রদান করিয়াছিলেন, এ ত সে সতী নহে,—এ সতী বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল সৌরকরদীপ্ত কুসুমকোরক নহে,—এ যেন সন্ধ্যামালতী—স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর, কিন্তু চক্ষুর পরম তৃপ্তিসাধক। সিংহ ধীরে ধীরে দক্ষালয়ের নিকটে আসিল, অমনই কলরব পড়িয়া গেল, সতী আসিয়াছে,—সেই কলরব অন্তঃপুরের প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞবেদীর পার্শ্বস্থিত দক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তাহাতে কঠিন হৃদয়ে অমৃত নিষিক্ত হইল। কিন্তু দক্ষ ঘৃণার দ্বারা প্রীতিকে পরাস্ত করিয়া বিমুখ হইয়া বসিলেন।

কিন্তু যখন সেই কলরব প্রসূতির কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি জাগরিতা কি স্বপ্নাবিষ্টা তাহা বুঝিতে পারিলেন না, একি মৃগতৃষ্ণিকা না উন্মাদ চিত্তক্ষোভ!

—রাণী অন্তঃপুর-দ্বারে আসিলেন, "আমার সতী বক্ষে আয়" বলিয়া সিংহবাহিনী-প্রতি হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া দিলেন, সেই মুহূর্ত্তে মাতাকন্যা আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলেন। উভয়ের গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রু পতিত হইতেছিল। কন্যা অভিমানিনী, মাতা লজ্জিতা।—এই উৎসবেও মেয়ে বলিয়া মনে হইল না। তোমার পাগল জামাতাকে ছাড়িয়া আসিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহাকে আনিতে পারি নাই।

দেখিতে দেখিতে কৃত্তিকা ও রোহিণী উপনীতা হইলেন। স্বাহাও তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তিনী, কৃত্তিকা স্বর্ণখচিত 'নীলাম্বরী' পরিয়াছেন, তাঁহার হস্তের শঙ্খবলয়ে চন্দ্রকান্ত মণি নিবদ্ধ ছিল। চন্দ্রের প্রিয়মহিষীর কণ্ঠে নীলমণিকণ্ঠী, তাঁহার কাঁচলীতে বিশ্বকর্ম্মা সপ্তবিংশ ভার্য্যাসহ চন্দ্রদেবের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিলেন। রোহিণীর বাম অঙ্গে দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিয়া কৃত্তিকা—তাঁহার রক্তপট্টবাসের প্রান্তভাগে শুভ্রমণিময় চিত্র অঙ্কিত, মস্তকে চন্দ্রকিরণের মুকুট, পদে মণির মঞ্জীর, কিন্তু স্বাহার বস্ত্রখানি হুতাশনের জ্যোতির ন্যায়। তিনি খর্ব্বাকৃতি বিপুলনিতম্বা তাঁহার কেশরাজি একটি জ্যোতিষ্মান্ পদ্মরাগমণির গ্রন্থিতে আবদ্ধ, রোহিণী আসিয়া সতীর মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। "ভগিনী, এক সিন্দূরই তোমার আয়তি-চিহ্ন, হস্তে রুদ্রাক্ষ-বলয়!" কৃত্তিকা বলিল, "ছি! বসন পরাইয়া এই উৎসবে পাঠাইতে শিবের লজ্জা হইল না?" স্বাহা বলিল, "ভগিনি তোমার এমন রূপ, আহা এত বড় চুলের গোছা তৈল ও মার্জ্জনার অভাবে জটাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জঙ্গলে মুক্তা ফেলার মত শিবের ঘরে তোমায় দেওয়া হইয়াছে, আর একখানি পদ্মরাগ মণি কি তোমার হাতে বাঁধিয়া দিতে পারিল না?" ইহার মধ্যে রবির দুই স্ত্রী ছায়া ও সংজ্ঞা তথায় উপনীত হইলেন। একজন পরাগণী রেশমী শাড়ী পরিয়াছিলেন, কষ্টিপাথরের রং, রাতের ন্যায় সেই শাড়ীর উজ্জ্বল হলদে পাড় ঝক্‌মক্ করিতেছিল, তাঁহার উত্তরীয় প্রান্তে স্বর্ণবিন্দু দীপ্তি পাইতেছিল। সংজ্ঞার মূর্ত্তি দীর্ঘ ও গৌরাঙ্গী,—একখানি নীলাভ মণির চূর্ণ রবির রশ্মি পরিয়া তিনি রূপস ছিলেন তুল্য-

ছিলেন। শচীর বাগান হইতে সংগৃহীত একটি মন্দার-কুসুমের মালা তিনি কণ্ঠে পরিয়াছিলেন। ছায়া আসিয়া বলিল, "এই নাকি সতী! শিব আমার নিকট বলিয়া পাঠাইলে ত আমি একখানি রক্তমাণিক্যের অঙ্গদ ও দুইখানি হীরার বলয় পাঠাইতে পারিতাম।—এরূপ উৎসবে কি এমন বেশে স্ত্রীকে পাঠাইতে হয়? ছায়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, "দুইটা জবাফুল ও বিল্বদল চুলে আটকাইয়া আসিয়াছে, দেবরাজের কাছে বলিয়া পাঠাইলেও ত একগাছি পারিজাতের হার পাঠাইয়া দিতেন, আমাদের কর্ত্তার সঙ্গে ইন্দ্রের বড় ভাব, আমরা জানিলেও অনুরোধ করিতে পারিতাম।"

সতী এই সকল মন্তব্য শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার এক মুহূর্ত্তও তথায় তিষ্ঠিতে ইচ্ছা রহিল না, গণ্ড আরক্তিম হইল। তিনি যাহাদিগকে শৈশবসঙ্গিনী, প্রিয়ভগিনী বলিয়া জানিতেন, যাহারা একটি বনফুল পাইলে তৃপ্ত হইত, একটুকু মুখের হাসিতে উল্লসিত হইত, এ ত তাহারা নহে, সেই সরল স্বচ্ছন্দ প্রাণ যক্ষের কবলিত হইয়াছে। সতীর হৃদয় সেইস্থান হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এমন সময়ে অত্রির স্ত্রী অনসূয়া সেইস্থানে আসিয়া সতীকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উৎসাহের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "একি দেখিতেছি, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী এই মেয়ে নাকি সতী! মরি, বিনা ভূষণে বল্কলবসনে জবাকুসুম ও রুদ্রাক্ষে শ্রীমূর্ত্তির কি শোভা হইয়াছে! যোগিনীর মত কুণ্ডল মা তোমাকে বড় সাজিয়াছে, মা তোমার পদের অলক্তক-রাগ ধরিত্রী শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে, বিভূতিতে কপাল বড় সাজিয়াছে। মা, কুবের তোমার ভাণ্ডারী, তথাপি তুমি সামান্য জবাফুল পরিয়া আসিয়াছ,—তুমি এই ধনরত্নগর্ব্বিতা সুন্দরীগণের পার্শ্ব হইতে আমার নিকট এস।" আনন্দে প্রসূতির মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি সতীর প্রতি মন্তব্য শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন সতীকে অনসূয়ার সঙ্গিনী করিয়া দিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন। রোহিণী বলিল, দেখ্‌লি, অনসূয়া মাসীর কথা, উহারা ঐ এক রকমের। স্বয়ং ভগবান্ দত্তাত্রেয় নাম স্মরণ করিয়া উহার গর্ভে জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন, এই গর্ব্বে উঁহার পা মাটিতে পড়িতে পায় না। উনি কর্দ্দম ঋষির কন্যা, ভাঙ্গা কুঁড়েতে জন্ম, আধপেটা খাইয়া থাকেন, বাকল ভিন্ন একখানি কাপড় কিনিবার কড়ি নাই, যা হোক, সতীর সঙ্গে মিশ্‌বে ভাল। বাবা কি সাধে ভাঙ্গড়ের যজ্ঞভাগ মানা করিয়া দিয়াছিলেন?" মুক্তবেণী দোলাইয়া আর্দ্রী রোহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, ও কথা বোল না। শিবের যজ্ঞভাগ মানা একথা যেন সতীর কানে না উঠে, মা যে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কি মনে নাই?" রোহিণী বলিল, "সতী এখানে নাই, তাহার কানে একথা উঠাবে কে?"

আম্রমুকুলের গন্ধে বাপীতীর ভরপুর, দক্ষভবনের উপরে এক বিশাল শ্যামপট বিস্তারিত রহিয়াছে, দ্বিপ্রহরে সৌরকিরণে সুদূর পল্লীনিচয়ের তরুরাজি সমুজ্জ্বল মনে হইল যেন হরিৎ শস্যে বসুন্ধরার সাড়ীর জমি প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই উজ্জ্বল সুদূরে অবস্থিত বৃক্ষপংক্তি সেই সাড়ীর পাড়। সতী সে স্থানে অনসূয়ার সঙ্গে দাঁড়াইয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলেন, দক্ষালয় হইতে যে কৈলাসপুরীর গগনালম্বী চূড়া তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, সেই মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। অনসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া সতী হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিলেন, শিশু অষ্টমবর্ষীয়, সে একটি পূজার ফুলের ন্যায় পবিত্র। সতী বলিলেন, "এই শিশুর মুখে ভগবানের রূপ আঁকা রহিয়াছে দেবমানুষসমাজে এমন অপূর্ব্ব শিশু আমি দেখি নাই।' অত্রিপত্নী বলিলেন "তুমি কি জান না যে, ভগবান্ আমার উদরে অবস্থান করিতে সম্মত হইয়া এই শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? দত্তের পিতা একশত বৎসর এক দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের তপস্যা করিলেন, তিনি এই একশত বৎসর বায়ু সেবন করিয়া ছিলেন,—তাঁহারই প্রার্থনায় ভগবান্ আমাদিগকে বরিয়াছেন।" এই বলিয়া অনসূয়া একখানি পেটারের উপর উপবেশন করিলেন, দত্তাত্রেয় তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া জানুর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। দ্বিপ্রহরের সৌরকিরণ মন্দীভূত হেতু শিশুর তুহিন কটাক্ষপাত স্পর্শ ক

লাগিল। সতী তাহার রূপ দেখিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিলেন। অনসূয়া বলিলেন, "এই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করিতেছিলেন,—শিবালয়ে তুমি বড় কষ্টে থাক।" সতী উত্তর করিলেন, "আপনার কি মনে হয়? কৈলাস-পুরীর সুখের কথা কি বলিব! সেখানে জগতের সমস্ত সাধ যোগিবরকে দর্শনমাত্র পূর্ণ হইয়া যায়। কত দিন নিম্ববৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আমি তাঁহার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছি। স্ত্রীজাতির ঈপ্সিত বসন, ভূষণ, আড়ম্বর আমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছে। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই আমার কর্ণের ভূষণ, তাঁহার পদসেবাই আমার হস্তের অলঙ্কার, তাঁহার মূর্ত্তিচিন্তাই আমার হৃদয়ের হার হইয়াছে। বলিব কি, তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিতাভস্ম পরম পবিত্র মনে করিয়াছি, সেই বিভূতিতে যে তত্ত্ব অঙ্কিত দেখিয়াছি, জগতের কোথাও তাহা নাই। এইজন্য বিভূতি লেপিয়া যোগিনী সাজিয়াছি; তাঁহার জন্য সিদ্ধি ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে হাতে কড়া পড়িয়াছে বলিয়া ছায়া-দিদি আক্ষেপ করিলেন। এ নন্দীর কাজ হইলেও সবই আমার কাজ। তাঁহার সেবায় যে কষ্ট, তাহা যেন আমায় জন্মে জন্মে পাইতে হয়, এই কড়াই আমার আয়তি-চিহ্ন।"

দেবী এই বলিয়া নীরব হইলেন, শিবকে প্রণাম করিয়া আসেন নাই—এই চিন্তায় পুনরায় অনুতপ্ত হইয়া আকাশপটে বিচিত্র কৈলাসগিরি শৃঙ্গমালার দিকে বদ্ধ-দৃষ্টি রহিলেন। অনসূয়া দেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। একদিকে দত্তাত্রেয় অপরদিকে সতী, দু-ই তাঁহার মনে অপত্যস্নেহের উচ্ছাস জাগাইয়া তুলিল, ভাই-ভগিনীর মত দুইটিকে দেখা যাইতে লাগিল। সেই সুদৃশ্য স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্পতরু সকল নব পল্লব ও কুসুমে ভূষিত ছিল। বকতরুর পল্লবান্তরাল হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসূন ফুটিয়া উঠিতেছিল—দেবী মনে করিলেন, তরু তদীয় পল্লবকরধৃত কোরকগুলি যেন পূজোপহার স্বরূপ দেবাদিদেবকেই উৎসর্গ করিতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমসম্ভার লইয়া মালতী তরুও যেন শিবপূজার আয়োজন করিতেছে। সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভা পশ্চিমগগনে

ব্যাপ্ত হইয়াছে। দেবী মনে করিলেন যেন দেবগণ শিব-পূজার সম্ভারসহ একখানি তাম্রকুণ্ড সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেবী ভাবিলেন, এ পূজায় শুধু তিনি যোগ দিতে পারিলেন না। হে প্রভু, আজি আর তোমার চরণপদ্ম পদ্মদল দিয়া, পূজা করিতে পারি নাই, ত্রিলোক অসংখ্য পুষ্পসমলঙ্কৃত উপহার লইয়া তোমার পূজা করিতেছে,—আমিই শুধু বাদ পড়িলাম। অদ্যকার দিন আমার পক্ষে বড়ই অশুভ। প্রভু, আমি আজ পাপ কর্ণে তোমার নিন্দাবাদ শুনিলাম। আবার কবে তোমার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া কর্ণ পবিত্র করিব,—সেই বাণী শত শত বীণাধ্বনি হইতেও শ্রুতিসুখাবহ।"

সতীর চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া অনসূয়া বলিলেন "মা! দুঃখিত হইও না। ধনমদে মত্তা তোমার ভগিনীগণ শিবের মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবে? সমুদ্র-মন্থনে কৌস্তুভ, পারিজাত, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ঐরাবত এবং অপরাপর বহুমূল্য রত্নরাজি দেবগণ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু যখন বিষস্রোতে বিশ্ব পরিপ্লাবিত হইল, তখন পরম দয়াবান্ শিব জগতের মঙ্গল কামনায় নিজে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া সেই বিষ-প্রবাহ কণ্ঠস্থ করিলেন, সৃষ্টি রক্ষা হইল। তিনি আমার স্বামীকে একদা বলিয়াছিলেন,—"ত্রিলোক যাহা ঘৃণায় পরিহার করে তাহাই আমার প্রাপ্য! অম্লান পট্টাম্বর দেবগণের আদৃত, ঘৃণা করিয়া তাঁহারা কেহ ব্যাঘ্রচর্ম স্পর্শ করেন না, তাই আমি উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারা অগুরু, চন্দনাদির পক্ষপাতী এবং ভস্ম ঘৃণা করেন এইজন্য ভস্মই আমার অঙ্গের ভূষণ। বিবিধ মণিরত্নপ্রবালমুক্তায় তাঁহাদিগের সাজসজ্জা, আর শ্মশানের পরিত্যক্ত অস্থিময় হাড়মালা আমি আদরে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারা পারিজাত পুষ্পের জন্য কলহ করেন, বিষাক্ত ধুতুরকুসুম জগতে পরিত্যক্ত, তাই উহা আমি কর্ণে পরিয়া থাকি। উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ঐরাবত প্রভৃতি বিবিধ বাহন দেবগণের কাম্য আমার 'কেহ না লইল তাই আছদে-বলদ।' আমি এই সব ঐশ্বর্য কিছুই চাই না, আমি শুধু সমাধির আনন্দ চাই।"—এই কথা বলিতে বলিতে শিবের সমাধি হইল, আমার স্বামী

স্তব্ধ হইয়া করজোড়ে সমাধিমগ্ন শিবমুখের সেই স্বর্গীয় সুষমা দেখিতে লাগিলেন।

"এই ত্যাগী দেবকুলশিরোমণির গৌরব কে বুঝিবে? বিষ্ণু একদা বলিয়াছিলেন যে, অপরাপর দেবগণ বিষ্ণুমায়া এড়াইতে পারেন নাই, একমাত্র শিব মায়ামুক্ত। তিনি কুবেরকে শিবের ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলেন,' কিন্তু শিব একদিনও শ্মশান ত্যাগ করেন নাই। শিব বিষ্ণুর নমস্ত।"

এই সময়ে প্রসূতি আসিয়া বলিলেন, "সতী একবার কিছু খাইয়া যাও।" অনসূয়া সতীর হাত ধরিয়া ভোজনস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দক্ষের অপরাপর কন্যাগণ ভোজনে বসিয়াছেন, সতীকে সকলে আদর করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসাইলেন। কৃত্তিকা যত্নের সহিত সতীর কেশপাশ গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, "ভগিনি, তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ? তা আর শিবপুরীর প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। সকলেরই কিছু আঢ্য ঘরে বিবাহ হয় নাই, যাহার যা, তাহাই ভাল। মা তোমাকে আমাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া স্বামিগৃহে পাঠাইবেন, তা' যেরূপ ঘর সে সব রাখিতে পারিলে হয়! তিনি প্রতি বৎসরের উপযোগী ভূষণ ও বস্ত্র তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তোমার আর কোন দুঃখের কারণ থাকিবে না।"

দেবী কোন উত্তর করিলেন না। এই সময় চিত্রা সংজ্ঞাকে বলিলেন, "দিদি, শচীর সঙ্গে নাকি তোমার বড় ভাব? শচীর হারে যে পদ্মরাগ মণিখানি আছে, তাহা দেবরাজ কোথায় পাইয়াছিলেন, শুনিয়াছ কি? উঃ, [illegible] অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, জহরী বিশ্বকর্মা তাহার পলগুলি কাটিয়া দিয়াছেন, এমন মণি অমরাবতীতে আর নাই।" সংজ্ঞা বলিলেন, "ঐ মণি সুন্দ-উপসুন্দের ঘরে ছিল, ইন্দ্র তাঁহাদের কোষাগারে প্রাপ্ত হন। উহা একবার মন্দাকিনীতে পড়িয়া গিয়াছিল, শুনিয়াছি নাকি মন্দাকিনীর যে স্থানে উহা নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে অপূর্ব্ব প্রভা বিকীর্ণ হইয়া জলের উপর ঠিক একটি উজ্জ্বল আলোর ফুলের মত দেখাইতেছিল, সুতরাং তাহা উদ্ধার করিতে

কোনই অসুবিধা হয় নাই।" চিত্রা বলিল, "সংজ্ঞা-দিদি! তোমার শাড়ীখানা ভাই বড় চমৎকার, নীলাভ্রমণির গুঁড়ার দ্বারা ইহা রঙ্গান হইয়াছে, তোমায় উহা বেশ মানাইয়াছে। এমন সময়ে রোহিণী বলিলেন, "ভাই, এখানে কি বেশীদিন থাকা চলে? মা আমায় একটি মাস থাকিতে বলিয়াছেন; উনকোটি তারা আমাদের বাড়ীতে আলো দেয়, এখানে যেন সব আঁধার আঁধার ঠেক্‌ছে, আর এখানে চলা-ফেরার বড় কষ্ট, সেখানকার বিস্তৃত ছায়াপথে বিমানে চড়িয়া যাই, আর এ পাড়াগেঁয়ে পথের কাঁকর কেবলই পায়ে বাজে।" রোহিণীর কথা শেষ হইতে না হইতে আর্দ্রা বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সোমরস এখানে পাওয়া বড় কষ্ট, দূত পাঠাইয়া আনিতে হয়, এখানে থাকা কি আমাদের সাজে? আর আমাদের কর্ত্তাটির যদিও আমরা সাতাইশ ভার্য্যা, তথাপি সব কটি সঙ্গে থাকা চাই, তিনি বলেন ঠাট বজায় না রাখিলে সম্ভ্রম থাকে না।" ইহার মধ্যে স্বাহার এক পুত্র সতীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "সতী-মাসি, শিব-মেশো কি ক'রে বাঘ-ছাল প'রে থাকেন? মা বল্‌ছিলেন, তোমার ভাল ভাল শাড়ী ও অলঙ্কার বেচে নাকি তিনি ভাঙ খেয়েছেন!" সংজ্ঞা বলিল, "দুষ্ট ছেলে, মাসীকে কি এ কথা বলিতে হয়?" পুনরুক্ত বলিল, "তা বেচারি করবে কি, স্ত্রীলোকের কপাল যা, তা ঘুচাবে কে? সতী তুমি মনে দুঃখ কোর না।"

মুক্ত ব্যোমবিহারী পক্ষীকে সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে তাহার যেরূপ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ঘটে, এই পার্থিব বৈভবের আলোচনা—ইঁহাদের প্রতি কটাক্ষ ও অযাচিত সহানুভূতি—এ সমস্তই সতীকে সেইরূপ তীব্রভাবে পীড়ন করিতে লাগিল। সতীর মনে হইল, দক্ষপুরী আর তাঁহার যোগ্য নাই, তাঁহার একমাত্র স্থান কৈলাস। সেখানকার আনন্দময় জীবন তাঁহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল: সেই স্বামীর ধ্যান-প্রশান্ত ভাবে শিবের দিব্য প্রতিভাত, সেই ভাবে তিনি মাহাত্ম্য, ভগিনীর স্নিগ্ধতা, স্বামীর আদর সবই অধিক দেখিতে পাইতেন। কৈলাসপুরীর প্রতি সম্পর্কে তিনি অনুভূতি, নিরাসক্তি ও সৌন্দর্য্যের অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কি দেখিতে আসিয়াছিলেন

আর কি দেখিতে লাগিলেন! যতই তাঁহারা বেশভূষার সমালোচনা করিতে লাগিলেন ততই বল্কল প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ কৈলাসের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। আজ শিবের চরণপদ্মে তিনি চম্পক ও বিল্বদল প্রদান করেন নাই, তাঁহার দিনটা বৃথা ও শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আকাশপানে তাকাইয়া দেখেন, মুক্ত অম্বর যেন দিগম্বরের দিগ্‌বাসের ন্যায় প্রসারিত, উৎসবের নানা বাদ্যরব অতিক্রম করিয়া তিনি পিনাকপাণির ডমরু-নিনাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের কৃপা তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া প্রসূতির নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম, একবার পিতাকে ডাকাইয়া আন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৈলাসপুরীতে চলিয়া যাই। আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।"

প্রসূতি বলিলেন, "সে কি! যজ্ঞ দেখিতে আসিলে, যজ্ঞ শেষ না হইতেই চলিয়া যাইবে? একি পাগলের কথা!"

সতী বলিলেন, "কেন বলিতে পারি না, যজ্ঞের ধূম আমাকে ব্যথিত করিতেছে, যজ্ঞের মন্ত্রের শব্দ অসিদ্ধ ও অপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। বেদী-পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণগণের কোলাহল অপবিত্র বোধ হইতেছে, আমি বলিতে পারি না কেন এই যজ্ঞ আমার প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে না। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ত এই যজ্ঞ অনুমোদন করিয়াছেন?"

প্রসূতি বুঝিলেন, শিবানীকে না বলিলেও এ যজ্ঞ যে শিবহীন, তাহা সাধ্বী মনে মনেবুঝিতে পারিয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "সিংহটা চলিতে বড় দোলে, তাহার পৃষ্ঠে এতটা পথ আসিয়া তোমার মাথাটা একটু ঘূর্ণিত হইয়াছে, এজন্য কিছু ভাল লাগিতেছে না, তুমি খাইতে পার নাই, দুই একদিন আরামে থাকিলে সুস্থ হইবে। যজ্ঞেশ্বর অনুমোদন না করিলে কি কোন যজ্ঞের আরম্ভ হইতে পারে? দক্ষ কোমলহৃদয়া সতীকে পাছে কোন-প্রকার অপমানসূচক কথা বলেন, এইজন্য তনয়ার আগমন-সংবাদ তখনও নিজে স্বামীকে বলিয়া পাঠান নাই।

এদিকে অন্তঃপুরদ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার জ্র কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছিল। যজ্ঞের সমস্ত সম্ভারের যেদিকেই সে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যজ্ঞের ধূমে তাহার শ্বাসরোধ হইতেছিল। বেদী-সন্নিহিত হোমাগ্নি তাহার নিকট চিতাগ্নির মত বোধ হইতেছিল, কেন তাহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যজ্ঞভাগ যে শিবকে নিবেদিত হইবে না, একথা সে জানিত না, কিন্তু সমস্ত দক্ষপুরীর বায়ুস্তর তাহার শরীরে অসহ্য অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদাহ উৎপাদিত করিতেছিল, কোন ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বিশাল বক্ষঃ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছিল।

চিত্রকূটে ভরত

দীনেশচন্দ্র সেন

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিববৃন্দে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন বর্ষায় চিত্রকূটে সর্জ্জ ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্রদল পক্ব হইয়া শাখায় দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন স্থান মত্ত-বিহগ কোলাহলিত ছিল, কিন্তু অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে পূর্ণ, উহাদের স্তর সুন্দর, কোথাও পর্ব্বতগাত্র হইতে এক শৃঙ্গ বৈদূর্য্যের ন্যায় উচ্চে উঠিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে—কোথাও মন্দাকিনী,—কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও [illegible] কৌপীনধারী [illegible] বিরাজমান। [illegible] [illegible] হইতেছিল, কোথাও [illegible] হইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন, "রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আমার হৃদয়ে কোন ব্যথা দিতেছে না,

আমি এই পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেছি।"

এই কথা শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্যরেণুতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে পশুপক্ষী চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তুর আগমনে এই সৌম্য নিকেতনের শান্তি এভাবে বিঘ্নিত হইতেছে?" লক্ষ্মণ দীর্ঘপুষ্পিত শালবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন। "কাহার সৈন্য আসিতেছে কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, "অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রান্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্নিত রথধ্বজ দেখা যাইতেছে,—অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্পে অগ্রসর হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্ত হৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজ্যলোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব।" ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে

কাঁদিতে লাগিলেন—"হেমচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জ্জিত হইত আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কায় ধূলিধূসর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ এই লোক-গর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!"—বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন দৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মাথায় জটাজূট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কোলে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—"বৎস তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন,—"আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন আমি আপনার ভাই, আপনার শিষ্য, দাসানুদাস আমার প্রতি প্রসন্ন হউন আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু মিনতি চলিল—রাম বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব, প্রতিজ্ঞাপালন আমার কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া কুটিরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার শোভিত মস্তকে ভ্রাতৃপাদুকা নিহিত পাদুকা তাঁহার মুকুটস্থানীয় হইল। মহত হৃদয় যে শোভা দিতে অক্ষম এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, "রাজভ্রাতঃ এই পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই কালমধ্যে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" [illegible] হইয়া ভরত বলিলেন, "[illegible]

নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দাগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কল পরিহিত ফলমূলাহারী—রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বসিবেন, তাঁহারা সকলে কাষায় বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কাষায় বস্ত্র পরিহিত, সচিববৃন্দ পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

ভরতের এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,—"এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্যাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না।" আর একদিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব ?"

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর। চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।"

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জলজন্তু যেরূপ 'স্বীয়' সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন,—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।"

কৈকেয়ীর সম্বন্ধে দোষ আমরা সবাই মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি—

"ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥"

অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।

চিন্তামণি ঘোষ

বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙালী স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও সাধুতার বলে নিঃস্বতম অবস্থা হইতে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত চিন্তামণি ঘোষ তন্মধ্যে অন্যতম।

চিন্তামণি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালিগ্রামে এক দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাধবচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমে কমিসেরিয়েট বিভাগে কাজ করিতেন। জননীর নিকট গ্রামে থাকিয়া চিন্তামণি পড়াশুনা করিতেন। তৎপরে পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি [illegible] মাতা ও ছোট ভগিনীর সহিত পিতার কর্মস্থান [illegible] গমন করেন। তথায় [illegible] কলিজিয়েট [illegible] ভর্তি হইয়া তিনি লেখাপড়া করিতে [illegible]। [illegible] তাঁহাকে [illegible] "তুমি [illegible] হইবে।" [illegible] হইলেও [illegible] তিনি [illegible] তাঁহার [illegible] করিতে [illegible] দিয়াছেন।

চিন্তামণির বয়স যখন বার বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতৃদেব কোন কার্য্যোপলক্ষে এলাহাবাদে গমন করিয়া তথায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া চিন্তামণি পিতামহী, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। সাধ্যানুরূপ চিকিৎসাসত্বেও মাধবচন্দ্র অল্পবয়স্ক পুত্রের স্কন্ধে সংসারের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তখন চিন্তামণি নিতান্ত নিরুপায় ও কপর্দ্দকশূন্য। তাঁহার মাতুল মহাশয় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু স্বাবলম্বী চিন্তামণি এলাহাবাদেই অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন।

এই সময় জনৈক আত্মীয়ের চেষ্টায় তিনি 'পাইওনীয়ার' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের অফিসে মাসিক দশ টাকা বেতনে একটি সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন। স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে তিনি শীঘ্র উপরিতন কর্ম্মচারিগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মুদ্রণ-কার্য্যের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তিনি মধ্যাহ্নে কর্ম্মবিরতির সময় মনোনিবেশ সহকারে মুদ্রা-যন্ত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ধীরে ধীরে ঐ কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপরদিকে বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময় তাঁহার মনে যে জ্ঞানপিপাসার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বিধাতার বিধানে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। রাত্রিকালে অবসর পাইলেই তিনি বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই পিপাসা নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন। পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট হইতে তিনি পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহা একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। স্মাইলস্ প্রণীত Self-Help নামক পুস্তকখানি তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। এই গ্রন্থ হইতে স্বাবলম্বনের প্রবল স্পৃহা তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। অফিসে কর্ম্ম করিবার সময় তিনি একখানি করিয়া পাইওনীয়ার পত্রিকা পাইতেন। ঐ পত্রিকাখানি তিনি প্রত্যহ আদ্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। সাত

বৎসর পাইওনীয়ার অফিসে কার্য্য করিয়া কোন বিশেষ কারণবশতঃ তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি রেল সার্ভিসে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর মিটিওরোলজিক্যাল অফিসে একটি ভাল কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই স্থানে চিন্তামণি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন।

মাসিক একশত টাকা উপার্জ্জন করিতে না পারা পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা হইলে তদীয় মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। তখন চিন্তামণি হাওড়া জেলার অন্তর্গত চনাই-বাগা-নিবাসী স্বর্গীয় কালীচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সুলক্ষণা কন্যার সহিত বিবাহ হইবার পর হইতে চিন্তামণির প্রতি ভাগ্যদেবী দিন দিন অধিকতর প্রসন্না হইতে লাগিলেন।

নিতান্ত দায়ে পড়িয়া চাকুরী গ্রহণ করিলেও স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে চিরজাগরূক ছিল। তিনি সুবিধা পাইলেই কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বাসনা। স্বর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ হইতে পারে বুঝিয়া তিনি কিছুদিন ঐরূপ একটি দোকান চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে [illegible] তাঁহার অভিজ্ঞতা [illegible] ছিল। [illegible] একদিন শুনিলেন [illegible] বাবুর [illegible] নিলামে বিক্রীত হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ [illegible] সহিত [illegible] ৫০০৲ টাকা মূল্য [illegible] করিয়া [illegible] হইতে [illegible] করিয়া তিনি [illegible] লাইব্রেরী [illegible] তিনি [illegible] [illegible] ১০০ টাকা [illegible] [illegible] হইতে

প্রেস চালাইতে লাগিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন তিনি এই প্রেসের নামকরণ করিলেন 'ইণ্ডিয়ান প্রেস'। এক্ষণে প্রসার ও প্রতিপত্তিবলে এই প্রেস সার্থকনামা হইয়াছে। প্রথমতঃ কাঠরাপল্লীর একটি ক্ষুদ্র গৃহে এই প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রেস স্থাপনের পরদিন হইতেই তিনি যথেষ্ট কাজ পাইতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহাকে ক্ষুদ্র প্রেসের সরঞ্জাম বর্দ্ধিত করিতে হইল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এক অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়া তিনি মিটিওরোলজিক্যাল অফিসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করায় তিনি বেতনের এক-চতুর্থাংশ মাত্র পেন্‌সন্ পাইয়াছিলেন। পরাধীনতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি এক্ষণে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। দিন দিন তাঁহার প্রেসের কাজ বাড়িতে লাগিল। বাঙ্গলা দেশের বাহিরে থাকিয়াও তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত স্বনামখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকা তাঁহার প্রেস হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত বলিয়া তাঁহার প্রেসের সুনাম শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িল।

ইতঃপূর্ব্বেই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কার্য্যবাহুল্য হেতু তিনি পাইওনীয়ার রোডে একটি বড় বাংলোতে তাঁহার প্রেস স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি তাঁহার ঐ প্রেস ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সাতলক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লয়। ঐ অর্থ দিয়া তিনি নূতন প্রেস স্থাপন করেন। এক্ষণে উহা সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক বিপৎপাতে কর্ম্মবীর চিন্তামণির সংসারে মহা-বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। বেরিবেরির আক্রমণে ১৬ দিনের মধ্যে প্রিয়তমা স্ত্রী, কর্ম্মক্ষেত্রে দক্ষিণহস্তস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং স্নেহের দুলালী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে

হারাইয়া তিনি শোকানলে দগ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু তিনি অসাধারণ ধৈর্য্যশীল পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন না। তথাপি তুষানলের মত এই দারুণ শোক তিলে তিলে তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল। অবশেষে তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হৃদ্পিণ্ডের উপসর্গরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

চিন্তামণি স্বনামধন্য কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। সাধু ও স্বাবলম্বী পুরুষ যে কোন অবস্থায় পতিত হইলেও স্বীয় উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে পারেন, ইহা তাঁহার জীবনে তিনি প্রমাণিত করিয়া পরমুখাপেক্ষী বঙ্গ-সন্তানগণের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহার সদ্ব্যবহারের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপদ ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থ 'হরিপদ দৈন্যনিবারিণী' নামক চক্ষু-চিকিৎসালয় এবং পত্নী ও মাতার স্মৃতিস্মরণার্থ 'গোলাপমোহিনী ও বিন্দুবাসিনী দাতব্য ভাণ্ডার' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত নিজে সহিয়াছিলেন বলিয়াই দরিদ্রের দুঃখ তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহা দূরীকরণার্থ এই দাতব্য হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

—(•)—

মোহেন্-জো-দড়ো

আজকাল এক প্রকার শিক্ষিত ব্যক্তি মোহেন্-জো-দড়োর নাম শুনিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের অন্যান্য ঢিবির ন্যায় এই ঢিবীটা অবহেলিত ছিল। সিন্ধি ভাষায় মোহেন-জো-দড়ো শব্দের অর্থ 'মৃতের

স্তূপ"। এই বিশাল নগরী একদিন সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া সমগ্র জগতে ভারতের গৌরব প্রচার করিত। প্রকৃতির অভিশাপে উহা পম্পিয়াই নগরীর মত ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল। গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐ নগরীর খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়। এস্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারত যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতায় জগতের অন্য কোন দেশের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে যেরূপ মিশরের সভ্যতা নীলনদের তীরে এবং মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে জাত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ সিন্ধুদেশের সভ্যতাও সিন্ধুতীরে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইজন্য এই যুগের সভ্যতাকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা যাইতে পারে। এই সভ্যতা মোহেন্-জো-দড়ো নগরীতে যে কিরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহা এখান হইতে প্রাপ্ত পুরা-বস্তু ও পূর্ত্ত-রহস্য দেখিলে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই প্রাচীনকালেও এখানকার অধিবাসীদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও শিল্পকৌশল একটি বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

মোহেন্-জো-দড়োতে তিন যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এখানে একাধিক নগরীর অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নস্তরে আদি ও মধ্য যুগের অতি সুন্দর পুরা-বস্তু ও ইমারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত সাতটি নগরীর বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রথম যুগের নগরগুলি এক্ষণে জলগর্ভে নিহিত রহিয়াছে, কারণ ভূগর্ভস্থ জলস্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তরে চলিয়া আসিয়াছে।

নগরগুলির পরিকল্পনা দেখিলে সহজেই বুঝা যায় তাৎকালিক শিল্পিগণ নাগরিকগণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া ইমারত ও পথঘাটগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরগুলি রাজপথ দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে

আছে। খুব সম্ভব তথাকার অভিজাত সম্প্রদায়ের জলক্রীড়ার জন্যই উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাসগৃহ, ভজনালয় ও স্নানাগার প্রভৃতি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় সিন্ধুতীরে এক উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন জাতি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাস করিত।

মোহেন্-জো-দড়োতে যে নরকঙ্কালগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কঙ্কাল ও মস্তক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এখানে চারি জাতীয় লোক বিদ্যমান ছিল। ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী অধিবাসীদের সহিত ঐ সকল লোকের সাদৃশ্য অনুমিত হয়। কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীদিগকে প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় জাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করেন। দ্রাবিড়ীয়গণ আক্রমণকারী রূপে পশ্চিম হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাই উক্ত অনুমানের হেতু। এখানকার অধিবাসীরা যেরূপ উন্নত ধরণের নাগরিক জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইতে বৈদিক আর্য্যগণের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ, বেদের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় আর্য্যগণ গ্রামে কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তদ্ব্যতীত উপাসনা পদ্ধতি, খাদ্য, জীবজন্তুর ব্যবহার প্রভৃতি হইতেও আর্য্যগণ ও মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীদিগের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ভারতীয় বৈদিক আর্য্যদিগকে মোহেন্-জো-দড়োর সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। মোহেন্-জো-দড়োর সভ্যতা সম্ভবতঃ আর্য্য সভ্যতা হইতে প্রাচীনতর। মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে অঙ্কিত ভাষাও আর্য্যভাষা না হওয়াই সম্ভবপর। পণ্ডিতগণ এখনও নিঃসন্দেহরূপে ঐ ভাষার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে নানা মতভেদও বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে অনেকের অনুমান মোহেন্-জো-দড়োর ভাষার সহিত দ্রাবিড়ীয় ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাগৈতিহসিক মোহেন্-জো-দেড়ো নামক গ্রন্থে সিন্ধু সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে

যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।—"ভারতীয় তাম্র-প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ যে সব স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সিন্ধুতীরবর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োই সর্ব্বপ্রধান। এখানকার সভ্যতার প্রত্যেক দিক্ বা অঙ্গ সুন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নাগরিক এবং সামাজিক জীবনেরও প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। পুরাকালে স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, স্বাস্থ্যসংরক্ষণে, পূর্ত্তবিদ্যায় শিল্প ও ললিত কলায় এবং নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোহেন্-জো-দড়োর জনসাধারণের যে গর্ব্ব করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, সেই কাহিনী তাহাদের পরিত্যক্ত পুরা-বস্তুই বহন করিয়া আনিয়াছে। এতদিন ইহারা ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ছিল। মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্ন-সম্পদ্ এখন খনিত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতবাসীদের সভ্যতার কথা বিবৃত করিতেছে।"

গরুর গাড়ী

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যতই চিন্তা করি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত বড় [illegible] খাপ খায়। [illegible]

বিচ্যুত হইলেই প্রাণসংশয়, রেলের উপর কোনও কিছু থাকিলে তখনই বোঝাই ট্রেণ পড়িয়া চুরমার, রাস্তা বে-মেরামত থাকিলে তৎক্ষণাৎ ট্রেণের গমনাগমন বন্ধ। তাহার পরে রেলের গাড়ীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে, তাহাকে হুঁসিয়ার করিতে, তাহার জল কয়লা সরবরাহ করিতে, অসংখ্য লোক ও অবিরত বন্দোবস্তের দরকার। রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য থামিবে, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে। কঠোর ব্যবস্থা, 'পদে পদে নিয়ম-অধীন'। ঠিক ইউরোপীয় সমাজের সভ্যতার অনুরূপ, সেই পোষাক পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, সেই কলার নেকটাই বেল্ট গার্টারের কসাকসি, সেই ডিনার টেবলের ড্রয়িং রুমের এটিকেটের আঁটাআঁটি সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক রীতি-নীতির বাঁধাবাঁধি, এক পা-ও স্বাধীন ভাবে ইচ্ছাসুখে এগোবার যো নাই।

গরুর গাড়ী হিন্দুসমাজের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক, জলে জঙ্গলে, বনে বাদাড়ে, পথে অপথে, ইহার অপ্রতিহত গতি, 'হাট বাট ঘাট-মাঠ ফিরি ফিরিছে বহুদেশ'। ইহা বাঁধা নিয়মের, কড়া আইনের নাগপাশে আবদ্ধ নহে। ধীরে ধীরে নীরবে নির্ব্বিকারে, নির্ব্বিবাদে ইহা সর্ব্বস্থানে গতায়াত করিতেছে। বিশাল বিরাট্‌ হিন্দু সমাজ যেমন 'শুঁড়িকাষ্ঠ নুড়িশিলা, ঘেঁটু, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি, ষষ্ঠীবুড়ী, কলা-বৌ হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল দেবতা নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিশেষে অঙ্কে স্থান দিয়া ধীর স্থির গতিতে ধ্রুব লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেইরূপ গরুর গাড়ীও শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বালুকাময় নদীপুলিনে, তুঙ্গ শৈলশিখরে, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, গভীর খাতে, পঙ্কিল জলাভূমিতে, সমান প্রীতির সহিত ধীর সংযত গতিতে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সমাজ ও যান উভয়ই শান্তি ও প্রীতির লীলাস্থান। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সমাজ বাষ্পীয় এঞ্জিনের ন্যায় রক্তনেত্রে উদ্দাম উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে, আর অণুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে উপনীত হইতেছে।

বোঝার উপর শাক আঁটিটা। যতক্ষণ থাকিব, স্থান ছাড়িবার সাহস নাই, পাছে বে-দখল হই, ষ্টেশনে নামিবার অবসর নাই, পাছে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, আমাকে ফেলিয়া যায়, 'সদা মন হারাই হারাই'। গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াও স্বস্তি নাই, নামিবার সময় অসাবধানতার জন্য সহযাত্রীদের ভ্রুকুটি, তাঁহাদের নিকট সবিনয় ক্ষমা প্রার্থনা (apology), মুটে ডাকাডাকি, পেটরা বাক্স নামাইবার তাড়াহুড়া সেই উপলক্ষে সহযাত্রী মহাশয়দিগের নিকট আর একপ্রস্থ ক্ষমা প্রার্থনা।

আর গরুর গাড়ী ? 'হেথা সুবিমল শান্তি অনন্ত বিশ্রাম'। লোকের ভিড় নাই, কোনও হাঙ্গামা নাই, কাহারও সহিত সঙ্ঘর্ষ হইবার আশঙ্কা নাই। I am monarch of all I survey, My right there is none to dispute, পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া যাত্রিসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে না। পুরু বিচালীর উপর তোষক ও চাদর পাতিয়া তোফা লম্বা হইয়া গা পা ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া আছি। উঠিলে মাথা ঘুরিবে, বসিলে বমনোদ্রেক হইবে, দাঁড়াইলে পতন অবশ্যম্ভাবী, এস্থলে 'শয়নে পদ্মনাভ' ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সূত্রকার ভবিষ্যৎ অভিধানে লিখিবেন, 'যে যানে চড়িলে শয়ন করিয়া থাকা অনিবার্য্য, তাহারই নাম গো-যান'। পেটরা বাক্স সব গাড়ীর পিছনে, যানের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতেছে। তাহার উপর পা তুলিয়া দিয়া শরীরের ভার লঘু করিতেছি। গাড়ীর মন্থর গতিতে ঈষদান্দোলিত চ্যাঙ্গারী মৃদু বায়ুহিল্লোল তুলিয়া টানাপাখার কাজ করিতেছে। বামপাশে তেলের চোঙ্গা অবিরাম এধার ওধার দুলিয়া পেণ্ডুলমের ন্যায় সময় নিরূপণ করিতেছে। ডাহিনে ছইয়ে গোঁজা কাস্তে Feudal castle এর ভিত্তিলম্বিত যুদ্ধাস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উপরে বিচিত্র বাখারী নির্ম্মিত ছই চন্দ্রালোকে অট্টালিকার কড়িবরগার ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। নীচে ঝুলান ছাঁদাবন্দী থালা-ঘটী-বাটী দুন্দুভি নিনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। মুহুর্মুহু আন্দোলিত কর্দ্দম-গোময়লিপ্ত

ওদিকে আবার গোপালদারক আর্য্যক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী'তে সিংহাসন লাভ করিবেন এই আশঙ্কায়, রাজা পালক তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি কারাগার হইতে পলায়নানন্তর গো-যানে আরোহণ করিয়া আত্ম-সংগোপন করিতেছেন, এবং রাজপুরুষ চন্দনক ও দ্বিজ চারুদত্তের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন।

এই দৃশ্যগুলি বিলীন হইতে না হইতেই মানসপটে এক পবিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। কৌণ্ডিন্য নামক মুনিসত্তম সন্তঃপরিণীতা শীলা নাম্নী সুশীলা ভার্য্যাকে লইয়া গো-যানে চড়িয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন। মধ্যাহ্নসময়ে নদীপুলিনে ব্রতধারিণী বহু কুলনারী অনন্তের ডোর ধারণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিমাতার নির্য্যাতন হইতে সদ্যোনির্ম্মুক্তা বালিকা-বধূ স্বামীর সৌভাগ্য কামনায় ঐ ব্রত গ্রহণ করিতেছেন এবং ব্রতসিদ্ধি ও ভবিষ্য সুখের ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ওদিক্ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া দেখিতেছি, সম্মুখে বিরাট্ দৃশ্য। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক ঋষিগণ অশেষভূতিলাভার্থ সোমযাগ করিতেছেন, রাজা 'সোম'কে গো-যানে স্থাপন করিয়া ছদি (ছই) দ্বারা আবৃত করিয়া 'হবির্ধান-প্রবর্ত্তন' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, এবং উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ক্রমে স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে ঋক্ উচ্চারণ করিতেছেন।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, ঐক্যশৃঙ্খল এই গরুর গাড়ী। হিন্দুর বাণিজ্য, হিন্দুর রাজনীতি, রাষ্ট্রবিপ্লব, হিন্দুর প্রমোদ হিন্দুর ব্রতাচার ধর্ম্মাচার, সকল প্রথার মধ্যেই এই গরুর গাড়ী পরিস্ফুটভাবে বিরাজ করিতেছে। আজ দৈববিড়ম্বনায় বিলাতী সভ্যতার কুহকে অন্ধ হইয়া আমরা সেই জাতীয় জীবনের চির সহচর গরুর গাড়ীকে হারাইতে বসিয়াছি। হায় আর্য্যসন্তান! (সঙ্কলিত)

বলী দ্বীপ

প্রমথ চৌধুরী

বলীদ্বীপ একরত্তি দেশ হলেও, কোনও একটি রাজার রাজ্য নয়। এই একশ মাইল লম্বা ও পঞ্চাশ মাইল চওড়া দেশ আট রাজ্যে উপবিভক্ত। আর এই আটটি ভাগের আটটি পৃথক্ রাজা আছে। এর থেকেই বুঝতে পারছ, এ দেশে যা আছে তা পুরোমাত্রায় হিন্দুরাজ্য। ভারতবর্ষও হিন্দুযুগে হাজার পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদেশে যে দুজন একচ্ছত্র রাজত্ব করে গিয়েছেন তাঁরা হিন্দু নন। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, আর আকবর মোগল। এক রাজার প্রজা না হলে একদেশের লোক যে এক nation হতে পারে না, এ হচ্ছে ইউরোপের মত। হিন্দুরা প্রাচীন যুগে যদি এক নেশন হয়ে থাকে ত সে এক ধর্মের কল্যাণে। আট রাজ্যে বিভক্ত হলেও বালীর অধিবাসীরা এক nation— এক ধর্মাবলম্বী বলে। ইউরোপে এখানে নেশন গড়ে রাজায় আর এদেশে সেখানে গড়ত দেবতায়। পশ্চিমের সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে রাজনীতি, আর পূর্বের সব চাইতে বড় কথা ছিল ধর্মনীতি।

যেমন রাজ্যের ব্যাপারে, তেমনি সমাজেও তারা পুরো হিন্দু। তারা একজাতি হলেও পাঁচ জাতে বিভক্ত। এ পাঁচ জাত হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডাল। এ পাঁচ জাতে পরস্পর বিবাহাদি করে না। পূর্বে অসবর্ণ [illegible] ছিল [illegible]। [illegible] যে এ [illegible] ও হত, [illegible] না হত, [illegible] হত [illegible], [illegible]। [illegible] হিন্দুসমাজ [illegible]।

[illegible]

কিন্তু এতটা নির্জ্জলা হিঁদুয়ানী এ যুগে চলে না। কারণ এ যুগের লোকের যখন তখন মরতে ঘোর আপত্তি আছে, কিন্তু যাকে তাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। তাই এখন নিয়ম হয়েছে যে, অসবর্ণ বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যার বর্ণ নিম্ন, অপর পক্ষও সেই বর্ণ ভুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ জাতিভেদের কাঠাম বজায় থাকবে, কিন্তু লোকের একবর্ণ ত্যাগ করে আর এক বর্ণে ভর্ত্তি হবার স্বাধীনতাও থাকবে। স্কুলের ছেলেরা যেমন পড়া মুখস্থ না দিতে পারলে উপরের ক্লাস থেকে নীচের ক্লাসে নেমে যায়, বালীর লোকেরাও তেমনি অসবর্ণ বিবাহের ফলে উল্টো প্রমোশন পায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে বলীদ্বীপে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন সে প্রথা উঠে গিয়েছে, এখন সতী যায় শুধু রাজার ঝি বৌরা। এর কারণ বোধ হয় রাজারা অবলাদের আঁচল না ধরে স্বর্গেও যেতে পারে না। সে যাই হোক, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেন্টিঙ্ক সাহেব এদেশে না এলেও এতদিনে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা উঠে যেত,—ছেরেপ কালের গুণে। বিবাহের পর আসে অবশ্য আহারের কথা। বলীয়ানরা কি খায় তা জানিনে, কিন্তু তারা গো-মাংস ভক্ষণ করে না, এমন কি, বলীদ্বীপে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা কিন্তু শূয়োর নিত্য খায়, তবে তাতে তাদের হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। সে দেশে সকল বরাহই বন্য বরাহ, কারণ দেশটাই হচ্ছে বুনো দেশ।

তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দু কথায় দিই। ভারতবর্ষের সব দেবতা বলীদ্বীপে গিয়ে জুটেছেন। এমন কি, কার্ত্তিক সমুদ্র লঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে, আর গণেশ ইঁদুর চড়ে। ইঁদুর যে পিঁপড়ের মত চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জানো, কারণ ছেলেরা চিরকালই মেয়েদের কাছে শুনে আসছে যে, পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়।

কিন্তু সেখানকার মহাদেব হচ্ছেন "কাল", আর মহাদেবী "দুর্গা"। বলীদ্বীপের দুর্গাপূজা নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। বলীদ্বীপের অধিবাসীরা বৌদ্ধও নয়, বৈষ্ণবও নয়। ওসব ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তাদের প্রধান ব্যবসা— অস্ত্রের ব্যবসা যে মারা যায়। আর বাকী থাকে শুধু বস্ত্রের ব্যবসা। একমাত্র বস্ত্রের সাহায্যে স্বরাজ হয়ত লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু তা রক্ষা করা যায় না।

বলীদ্বীপের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, দেব-দেবতার সংক্ষেপে যে পরিচয় দিলুম, তার থেকেই বুঝতে পারছ তারা যে হিন্দু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এমন কি, যে-সব ইউরোপীয়ের সে দেশের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা বলেন যে তাদের যদি কেউ অহিন্দু বলে, তাহলে তারা অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠে।

বলীদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আছে, তখন সে দেশে নিশ্চয় পণ্ডিতও আছে। এই পণ্ডিতদের নাম "পেদণ্ড"। বালীর পণ্ডিতরা সংস্কৃত পণ্ডিতের অপভ্রংশ না হয়ে কি করে যে ইংরাজী Pedant এর অপভ্রংশ হল, সে রহস্য আমি উদ্ঘাটিত করতে পারিনে। তবে নামে বড় কিছু আসে যায় না। আমাদের দেশের পণ্ডিত, বিলেতের Pedant, ও বালীর পেদণ্ড সবাই একজাত; তিনজনই সমান মূর্খ। [illegible] বলা হয়েছে যে,—

"[illegible] পণ্ডিত [illegible] যদি মূর্খ"।

ইউরোপের [illegible] পণ্ডিতরা [illegible] পেদণ্ড [illegible] বলীদ্বীপের পণ্ডিতরা কোনও [illegible] না [illegible] পেদণ্ড হয়, [illegible] 'মূর্খ' হবার চাইতে 'মূঢ়' হওয়ার [illegible]।

* * * * *

[illegible]

যে বক্তৃতা করলুম, তার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বীপান্তর-গমনের প্রবৃত্তি উদ্রেক করা নয়,—আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল উদ্রেক করা। নিজের দেশের অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ায় কোন লাভ নেই, কারণ যার অতীত অন্ধকার তার ভবিষ্যৎও তাই—অর্থাৎ সেই জাতেরা, যার অতীত বলে একটা কাল ছিল।

(কোন পারিবারিক সমিতিতে পঠিত)

জলসত্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি মহাশয় শিমুলাডী যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খর রৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন। মাঠের চারিধারে কোন দিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া কটা। ব্রাহ্মণের কাপড় চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হ'য়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ার গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা এ-মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছা করে, প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল এ কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন সে কেবল বোধ হয় কপালে দুঃখ ছিল ব'লেই।

পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই কেবল চকচকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিভ্ জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এত বেশী হোল যে, সামনে ডোবার পাতা-পচা কাল জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিশ্বাসে যেন আগুনের হলকা বেরুতে লাগলো। জিভ্ চোষ করে' চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ রৌদ্রে যেন নাচছে চকচকে বালিরাশি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণী হাওয়া গরম বালিধুলো কুটো উড়িয়ে নাকে মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।........ভয়ঙ্কর পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হোতে লাগলো— একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি। .....জীবনে

কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই, আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির উপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির উপর ছট্‌ফট্ করে' প্রাণ হারিয়েছে।......সত্যিই তো! • এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম তিনিও? •

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চল্‌তে লাগলেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা কন্‌কনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজী জিতলে সেই জল ঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মত চল্‌ছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে' উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন বোধ হয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বট গাছ। গাছটার তলায় কোনো পুকুর হয়তো থাক্‌তে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র। চার পাঁচটা নূতন জালায় জল, এক পাশে একরাশি কচি ডাব। এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা। বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসে ছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর মহাশয়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

একজন বল্‌লে—আহা, সে কথা রাখো, বাবা ঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন্।

শিরোমণি মশায় সেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বট গাছটা প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।......একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল করবার জন্যে। আঃ কি ঝিরঝিরে হাওয়া! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হোল। একজন বল্লে—ঠাকুর মশায়, হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন্। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে' একটু জল খান্, এই রোদে এখন আর যাবেন না—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণি মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কাদের?

—আজ্ঞে, ঐ আমড়োবের বিশ্বেসদের। শ্রীবৎস বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস নাম শুনেছেন?

শিরোমণি মশায় বললেন—বিশ্বেস? সদ্গোপ?

আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ। নতুন মাটির জালা ভর্ত্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত্ত শিরোমণি মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন তা তাঁর এক মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে' জল খাবেন? তিনি নিজে ও তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী আর কি তিনি—ওঃ। ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন! নইলে, এখনি তো·শিরোমণি মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া?

—তা আজ প্রায় পনেরো ষোল বছর হবে। শ্রীবৎস বিশ্বেসের বাপ, তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র প্রতিষ্ঠা করে। সে হয়েছিল কি, বলি শুনুন। বলে' লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমড়োবের তারাচাঁদ বিশ্বেস তখন ছোট—তার পনেরো বছর বয়স—তখন

তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'দশ বছরের একটি বোন্ ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই বোনে মাথায় করে' কলা বেগুন কুমড়ো এই সব হাটে বিক্রী করতো; এতেই তাদের সংসার চল্‌তো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রী করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্য্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্য্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আস্‌তে তারাচাঁদের ছোট বোন্‌টা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি, ছোট বোন্‌টি মাঠের মাঝামাঝি এসে বল্‌লে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বল্‌লে—একটু এগিয়ে চল্, রতনপুরের কৈবর্ত্ত পাড়ায় জল খাওয়াবো।

সেই একটু আগিয়ে' মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়লো। বারবার বলতে লাগলে—ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল।

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বট গাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেল্‌লে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বল্‌তে পারছে না। তারাচাঁদা তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্ত্তপাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোট বোন্‌টা গাছতলায় মরে পড়ে আছে তার মুখে একটা কচুর ডগা। এই বট গাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টার যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে' তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নাম হোল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে' বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি না কি তার সে বোন্ স্বপ্নে দেখা দিয়ে বল্তো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্যে তুই একটা জলসত্র করে' দে! ··তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে' জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এ দিকের সকলেই জানে। বল্বো কি বাবা ঠাকুর, এখনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে' ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক না কি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বল্ছে—ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।··

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে, তারপর বল্লে—সত্যি মিথ্যে জানিনে ঠাকুর মশায়, লোকে বলে তাই শুনি। বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে' কি শেষকালে·

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে' কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম কর্লে।

বেলা পড়ে' এল। কত লোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো।

একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে' সে তুঁথের সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে' গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ী অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে' ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বল্লে—আহ্লাদের মা, একটা ডাব খাবা?

আহ্লাদের মা একগাল হেসে বল্লে—তা দাও দিকি মোরে বাপ আধটা খাই। বাবা গো, তেষ্টেই মরি।

একজন লোক পরণে টাটকা ধোয়া কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙ্গা

ধপ্ধপে সাদা টুইলের সার্ট, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তোলা, পায়ে এক-পা ধূলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ্ করে বসে' পড়লো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতা সঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে' ভূমিকা ফেঁদে তার মোকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে' গেল এবং যে উকীলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হোত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে ছোলা উদরসাৎ করে' এক ছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে' গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদে রংএর সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পিছনটা আলো করে' ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা—ক', বৌ কথা—ক'।

শিরোমণি মশায়ের বসে' বসে' মনে হোল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলী মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেয়ে উঠে এই জলকষ্ট-পীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেছে। এরই তলায় আজ বিশ বছর ধ'রে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী পথিককে জল যোগাচ্ছে। চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া শীতল হয়ে আসে··তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র আঁচল উড়িয়ে কোন্ অজ্ঞাত ঊর্দ্ধলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়। তাঁর পৃথিবীর বালিকাজীবনের ইতিহাস সে ভোলেনি।

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি মশায় তাকে বল্‌লেন—ওহে বাপু, তোমার ঐ বড় ঘটীটা বেশ করে' মেজে একঘটী জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বল্‌লে না?

গণ্ডার শিকার

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

হরিণ শিকারে বড় আনন্দ পাওয়া যায় যদিও তাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। পাঠক আমাকে হঠাৎ কাপুরুষ বলে বসবেন না যেন। হরিণগুলো যে রকম নির্দয়ভাবে ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করে, তা দেখলে বুঝবেন যে তাদের মেরে ফেলা অহিংসাধর্মীর একটা কর্তব্যের মধ্যে। বরাহ আর হরিণ কৃষকের এত বড় শত্রু বলেই মৃগ-মাংস নিরামিষের প্রশস্ত পাত্র বলে নির্ধারিত হয়েছিল। Sport-এর জন্য হরিণ শিকার পাওয়া

হেঁটেই হয়। দূর থেকে হরিণ নজর করে নিয়ে, আস্তে আস্তে কখনও ঝোপের আঁড়ালে লুকিয়ে কখনও বুকে হেঁটে, সন্তর্পণে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌঁছানয় যে কত আনন্দ তা বর্ণনা করে বোঝান সম্ভব নয়। তার পরে ঠিক জায়গাটিতে গুলি না লাগাতে পারলে হরিণ হস্তগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ, সে এক ছুটে ক্রোশ-খানেক বেরিয়ে যাবে। ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করাতে কিন্তু সেরা হচ্ছে গণ্ডার। একা একটা গণ্ডার এক রাত্তিরের ভেতর বেশ আট-দশখানা ক্ষেত বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। তাই উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা গণ্ডার মাংসকে অতি পবিত্র মনে করে। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় এই মাংস পেলে শ্রাদ্ধ নাকি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। আগে ঐ দেশে অজস্র গণ্ডার ছিল। ক্রমশঃ খুব কমে গেছে। শুনলাম সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার নাকি গণ্ডার বাঁচাবার জন্য আইন করেছেন। এই দরদটা সময়ে হলে, আজ অতিকায় megalosaurus ও dinosaurus পথে পথে ঘুরে বেড়াত। বাড়ী বাড়ী টিয়া পাখীর বদলে লোকে pterodactyl পুষত। তারা ত সব গেল, এখন গণ্ডারটা বাঁচলেই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য কায়েম থাকবে। কি দয়ার শরীর মানুষের! পাখীমারাদের কিন্তু দয়ামায়া নেই, তাদের মন্ত্র, "মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার"! কিন্তু সকলের অদৃষ্টে ত গণ্ডারের দেখা মেলে না। আমার কপালক্রমে একবার মিলেছিল, পাঠককে সেই গল্পটা শোনাব। একদিন কুচবেহারে দুই খবরিয়া আমার কাছে এসে বললে যে, এগার মাইল দূরে এক গণ্ডার এসেছে, আর গাঁয়ের লোকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাকে কোন রকমে আটকে রেখেছে এক বাবলা বনে। তাদের ইচ্ছা, আমি গিয়ে মারি। সে সময় সারা রাজ্যে গোটা পাঁচ সাত গণ্ডার বই ছিল না। তাদের সযতনে সরকারী জঙ্গলে পুরে রাখা হত, বংশ বৃদ্ধি হবে এই আশায়। আমি স্থির বুঝলাম যে, এ ভাবি একটা, আর এক আমি মারলে রাজদণ্ড, অন্ততঃ রাজরোষ, অবশ্যম্ভাবী। মেজ রাজকুমার তখন কুচবেহারে ছিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, গণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযান অবশ্য

কর্তব্য। তবে শিখিয়ে পড়িয়ে এই গল্প রচনা করা গেল যে, জানোয়ারটা এ রাজ্যের নয়, রঙ্গপুর জেলা থেকে এসেছে। গাড়ী চেপে আমরা কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। তিনটি হাতী সংগ্রহ করে পাঠান হয়েছিল। এক দল কলেজের ছাত্র গেঁড়া মারা দেখার জন্য জিদ করে সঙ্গে চলল। পৌঁছে দেখা গেল, আট দশ বিঘে এক বাবলা বন, তাই ঘেরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে, কেরোসিনের টিন ঢোলক ইত্যাদি। রাজকুমার একটা হাতী চড়ে দূরে বনের উল্টো পিঠে চলে গেলেন। স্ব—দ্বিতীয় হাতী নিয়ে ডাইনের দিকে গেলেন। বনের সামনে যে একটু খোলা ময়দান ছিল, তার একদিকে কচুয়া সাহেব তৃতীয় হাতীর উপর রইলেন, অন্যদিকে আমি ছেলেদের নিয়ে ভূঁইয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজকুমার আমার হাতে একটা খুব জোরালো Cordite বন্দুক দিয়েছিলেন কিন্তু আমার মতলব ছিল যে পারতপক্ষে বন্দুক ছুঁড়ব না। ছেলেদিকে আমার পিছনে সূচীব্যূহ করে দাঁড় করিয়েছিলাম। তাদের তালিম দিয়ে রেখেছিলাম যে, গেঁড়া যদি আমাদের পানে তাড়া করে, ত সকলে দিগ্ বিদিকে দৌড় দেবে, সোজা নয়, এঁকে বেঁকে। তাদের বাঁচাবার জন্যে দরকার হয় ত আমি বন্দুক ছুঁড়ব, নইলে নয়। সকলে আপন আপন ঘাঁটি নিলে পর একটা বাঁশী বাজলে আর চাষারা চারিদিকে মহা উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। দেখা গেল যে, বনের ভেতর একটা বাচ্চা হাতীর মত জন্তু দৌড়াদৌড়ি করছে, একবার এদিক একবার ওদিক, যেন ভয় পেয়েছে। হঠাৎ দড়াম করে এক মোটা আওয়াজ হল বোঝা গেল স্ব—তার প্রকাণ্ড মোটা ten bore রাইফেলটা ছুঁড়েছে। গেঁড়া বনের ভেতর লুটিয়ে পড়ল। স্ব—চেঁচিয়ে বললে, "সাবধান জিং, লেগেছে". আবার বন্দুকের আওয়াজ হল, এবার পিঠ পোড়ের শব্দ, বুঝলাম রাজকুমার মারলেন। গোঁ করে একটা গুলি ছেলেদের মাথার উপর দিয়ে চলে

গেল। ভীষণ দুর্ঘটনা হতে হতে বেঁচে গেল। কিন্তু বিধাতাপুরুষকে ডাকবার আমার সময় ছিল না, কারণ তখনই সেই প্রকাণ্ড গণ্ড-মৃগ জঙ্গল ভেঙ্গে ময়দানে উপস্থিত হল। কোন্ দিকে যায়! দেখতে দেখতে কচুয়া সাহেবের হাতীর দিকে মাথা নীচু করে তেড়ে গেল। ভাগলো হাতী ল্যাজ তুলে। সাহেব দুবার বন্দুক চালালেন, লাগল না। গণ্ডারটা যে কি ভয়ানক দেখাচ্ছিল কি বলব! সু-র গুলিটা গলার কাছে লেগে অনেকখানা মাংস বেরিয়ে পড়েছে, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত বইছে। রাগে পাগল হয়ে প্রথমে হাতীটাকে তাড়া করলে, তারপর এক টাট্টু ঘোড়া চরছিল, সেটাকে প্রায় খতম করলে। আমরা কৃষ্ণনাম জপছিলাম, কিম্বা ওইরকম একটা কিছু করছিলাম। যাক্, ছেলেদের দিকে ফিরল না। বিশ-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কি বিকট শব্দ হচ্ছিল, কি রকম থক্ থক্ থক্ করে কাসছিল, আর গায়ের ঢালগুলো থসথস আওয়াজ করছিল। আমার বেয়ারাটা ত ভয়ে আত্মহারা হয়ে কুকরি হাতে সেই জখম গেঁড়ার পিছু ছুটল। গেঁড়া পালাল, পিছু পিছু উড়ে বেয়ারা। কচুয়া সাহেবকে নিয়ে তাঁর হাতী অন্তর্দ্ধান। দুই এক মিনিটে রাজকুমার ও সু "কোথা গেল, কোথা গেল" করতে করতে এসে পড়লেন। আমি বলে দিলাম আমার বেয়ারার পাগড়ী লক্ষ্য করে সোজা চলে যাও, কিন্তু ও বেচারাকে মের না যেন! হাতী ছুটো ছুটল আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। একটু গিয়েই দেখি, অনেক দূরে গেঁড়াটা কুকুরের মতন ল্যাজের কুণ্ডলীর উপর বসে রয়েছে। বোধ হয় আর দৌড়বার দম নেই। প্রায় তিনশো কদম দূর থেকে রাজকুমার গুলি লাগাতেই উল্‌টে পড়ল। তারপর দু'দিন ধরে সেই পবিত্র মাংস বিতরণ হল। সেদিন বন্দুক না মেরে আমি বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম। রাজকুমার নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিলেন, তাই মহারাজের রাগ হতে সু বেঁচে গেল।

বিলাতের গ্রামে

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যে অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম 'আইল্ অব্ ওয়াইট্'। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারি মধ্যে গুটি আটদশ ছোট ছোট শহর ও বিশ পঁচিশটি ছোট ছোট গ্রাম। এই শহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিষ্ট-জীবী। গ্রীষ্মকালে যে সব 'টুরিষ্ট' আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের দৌলতে বৎসরের বাকী সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমায়। তখন হোটেলগুলো খাঁ খাঁ করতে থাকে, দোকান-পাট কোনো মতে বেঁচেবর্ত্তে রয়, খেলার মাঠে আগাছা গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণতঃ চাষী মুদি রুটিনির্ম্মাতা নাপিত জেলে মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এই সব শহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোট ছোট গ্রামগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

শহর যেমন সব দেশেই প্রায় একই রকম, গ্রামও দেখলুম সব দেশেই প্রায় এক রকম। বৃক্ষ প্রকৃতির মাঝখানে ইট পাথরের দেয়ালের ওপরে খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে ছাদের ওপর ঘাস গজিয়েছে — এরি নাম 'কটেজ'। তবে নূতনের সঙ্গে সন্ধি না ক'রে পুরাতনের গতি নেই। সঙ্কীর্ণ গবাক্ষ, কিন্তু কাচের সার্সী। সেকেলে গড়ন, কিন্তু একেলে সরঞ্জাম। মুদির দোকানে ডাকঘর বসেছে, তামাক চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেল ষ্টেশনের ভিতরে [illegible] [illegible] আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে পাব্লিক লাইব্রেরী আছে। [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংখ্যা [illegible] [illegible]

বাঁচে। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে বলাৎকার সব দেশেই চলে এসেছে এ যুগের শিশু সে-বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটী। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়ীঘর সুখদৃশ্য। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার (চিম্‌নী-সুইপ) যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ির বাইরে বেল্ আছে, তার কাচের জানালার ওপাশে ধব্‌ধবে পর্দা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আসবাব, সমস্ত গৃহটির বাইরে ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারি-পাট্যের আভাস যে, তেমনটি আমাদের ধনীদের গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে, সে মন ভোগ-তৎপর মন। সেটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না, যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জন করে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি, যে-দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে গৃহে বাস করি সে গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহলোককে এরা ম'রেও ছাড়তে চায় না, কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটির শরীরখানা থাকবে।

তাছাড়া আমার মনে হয় এ দেশের এই গৃহপারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এদেশের নারীশক্তির সক্রিয়তা। আমরা ইহবিমুখ, ধর্ম্ম হচ্ছে নারী-বিমুখ ধর্ম্ম, আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি করতে পায় না। ইংলণ্ডের নারী তার স্বামি-গৃহের রাণী, শাশুড়ী-জা'দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, নিজের

বাড়ীর মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনেও অনেক বাড়িতে ছোট একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরেজেরা বড় ভালবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা 'হবী'। গ্রামে দেখলুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্পগুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটাতে টি'ল দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক এদেশের মেয়েরা উপার্জ্জন করতে পটু, তথা উপার্জ্জন বাঁচাতেও পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ' পেনী খরচ ক'রে কতখানি 'সাপার' (নৈশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিম্বা অল্প খরচে কী কী পোষাক স্বহস্তে তৈরী করা যেতে পারে প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দ্দেশ ক'রে দেন গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষ। অনেক বাড়িতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্য্যটকদের চা খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এই সব "টী-গার্ডেন" ছাড়া অনেকের বাড়িতে বা ফার্ম হাউসে দু' তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে "পেয়িং গেষ্ট" রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগী শূয়োর গরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থাগমের ও অর্থ-সঞ্চয়ের যত উপায় আছে কোনোটাই কেউ পারৎপক্ষে বাদ দেয় না।

* * * * *

আইল্ অব্ ওয়াইট্ বড় সুন্দর স্থান। নীল রঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মত সুন্দর। তবে এদেশের সবুজ যে আমাদের দেশের মতো কান্ত নয় স্নিগ্ধ নয়, কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়, ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে, আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশী। দ্বীপটীর কোনো কোনো স্থান এত নিরালা যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চোখ সেদিন তন্দ্রালসে বুজে পড়তে চায়। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীরভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার

ওপরে চিলের মতো উড়্‌ছে এরোপ্লেন—এত ওপরে যে, তার বিকট কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছয় না। কানে বাজছে শুধু জলকণ্ঠের ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। ...মাটি তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ। ঘুমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে যেন স্বপ্ন না মায়া, না মতিভ্রম। সত্য কেবল ঐ আপন ভোলা শিশুগুলি ঐ যারা বালি দিয়ে ঘর তৈরি কর্‌ছে, বাঁধ তৈরি কর্‌ছে, ঘরের মধ্যে ভালো-বাসার পুতুলকে রাখ্‌ছে। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি।

গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগলো। বিদেশী দেখলেই সম্মান ক'রে কুশল প্রশ্ন করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। শহরে ইংরাজদের দেখে ইংরেজ জাতিকে যতটা নিঃসঙ্গ প্রকৃতি ভেবেছিলুম গ্রাম্য ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হলো না। সৌজন্যের চেয়ে বড় জিনিষ সৌহার্দ্য। গ্রামের লোকের কাছে অনায়াসেই ও জিনিষ পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা 'ইন্‌ট্রোডাক্‌শনে' ভাব করবার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির উপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকের হাতে কাল অসীম। সময়কে তারা ফাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক [illegible] তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়তা যেমন সব দেশে, তেমনি এদেশেও। নিজের গ্রামের যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই [illegible] [illegible] আলোচনা। [illegible] শুঁকে না [illegible] [illegible] নেই [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

[illegible]

পল্লীতে যত লোক থাকে তার তিনগুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্ম্মাণীতেও ক্রমশঃ গ্রামকে শোষণ ক'রে নগর মোটা হচ্ছে। Back to the village যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমত তো মনে হয় না। বড় জোর গ্রাম থাক্‌বে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম্য সভ্যতার শবখানাতে ভর কর্‌বে নাগরিক সভ্যতার তাল বেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই ক্ষুদে সংস্করণ। তাছাড়া গ্রামে নগরে ভেদ-রেখা কোন্‌খানে টানব? লোকসংখ্যা বাড়লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগত নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলে ভ'রে যাচ্ছে, ভাড়াঘরে ভরে যাচ্ছে। এর মানে এই যে এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে করে বেড়ায়, আমরা তা করিনে। অন্যলোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিতে থাকি। এক কালে আমরা যাযাবর ছিলুম। তারপর কোন একদিন ধানের ক্ষেতের ডাকে ঘর গড়লুম স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর। এতে শীত-আতপের কষ্ট আছে, ধুলো-বালির ঝড় আছে, কোথাও কর্দ্দম, কোথাও কঙ্কর, তবু এও ভালো।

———

লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(বর্ণানুক্রমিক)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—(জন্ম ১৮৪৬, মৃত্যু ১৯১৭।) ইঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার সুলেখক ও সুকবি ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র বাল্যকাল হইতে অতি মেধাবী ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া অক্ষয়চন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ, এ এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, এল্. পাশ করিয়া ইনি বহরমপুরে চারি বৎসর ওকালতী করেন। তাহার পর ইনি সাহিত্য-সাধনায় সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের ইনি একজন সুযোগ্য লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইঁহারই রচিত। সেগুলি ইনি স্বনামযুক্ত পুনর্মুদ্রিত করিবেন এইরূপ ভরসা আছে। ইঁহার রচিত সেই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গদেশে অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য-

উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইনি ঐ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইনি বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের কার্য্য করিয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত না হইলেও সাহিত্যিকগণের উৎসাহদাতা এবং মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ—(জন্ম ১৮৫৮, মৃত্যু ১৯৩৫।) যশোহর জেলার খরসুতি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সুদীর্ঘকাল বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করেন। পরবর্ত্তী জীবনে ইনি একজন অভিজ্ঞ হেড্‌মাষ্টাররূপে সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর বৃদ্ধবয়সে যুবকোচিত উৎসাহের সহিত পালি হইতে জাতক নামক বুদ্ধদেবের অতীত জন্মবৃত্তান্ত-সংক্রান্ত গল্পগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দান তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—(জন্ম ১৮২০ মৃত্যু ১৮৯১।) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি অদম্য অধ্যবসায়বলে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াও ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হন। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট নানা-ভাবে ঋণী। কেহ কেহ তাঁহাকে 'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থ তখনকার দিনে এক নূতন রচনা-পদ্ধতির ('style') প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ঐ পদ্ধতিকে 'বিদ্যাসাগরী' ভাষা নামে অভিহিত করা হইত। আধুনিক যুগে আমরা যে সাধুভাষা ব্যবহার করি

তাহাও বিদ্যাসাগরের পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র। ইনি নিজের অধ্যবসায়বলে পরিণত বয়সে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কেবল সাহিত্যিক হিসাবে নহে, সমাজ-সংস্কারক এবং আর্ত্ত-জনের সেবকরূপেও তিনি বাঙ্গালাদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—(জন্ম ১৮৪৩, মৃত্যু ১৯১১।) ঢাকা জেলার ভরাকৈর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অল্প বয়স হইতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি যশস্বী হন। ইনি 'বান্ধব' নামক একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত 'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথচিন্তা', নিভৃতচিন্তা',—এই তিনখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। এই গ্রন্থগুলিতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকার 'সারস্বত সভা' হইতে ইনি 'বিদ্যাসাগর' এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি, আই, ই' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—(জন্ম ১২৭০ বঙ্গাব্দ মৃত্যু ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।) ইনি ২৪-পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এম্. এ. পাশ করিয়া ইনি জেনারেল এসেমব্লিজ্ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে ইনি অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিয়া নাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইঁহার রচিত 'আলিবাবা' 'চাঁদবিবি' প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি নাটক জনসমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। কিছুদিন ইনি 'অলৌকিক রহস্য' নামক একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(জন্ম ১২৬৫ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।) ইনি ২১ বৎসর [illegible] করেন। [illegible] আরম্ভ করেন। [illegible] ইনি [illegible] করেন। ইঁহার রচিত [illegible]

'কমলকুমার' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু ইহার 'বিদ্যাসাগরের জীবনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ জীবনচরিতখানিই বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে।

চন্দ্রনাথ বসু—(জন্ম ১২৫১ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।) ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এম্, এ, এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পাশ করিয়া ইনি কিছুদিন ওকালতী করিবার পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু একার্য্য তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তিনি কিছুদিন শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়া অবশেষে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্ হন। পরে ইনি অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন',' নব্যভারত', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রগুলিতে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। ইঁহার প্রবন্ধগুলি বিশেষ গবেষণাপূর্ণ এবং মৌলিকতার পরিচায়ক। ইহার রচিত 'শকুন্তলাতত্ত্ব', সাবিত্রীতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

চুণীলাল বসু—(জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৩১।) ইনি মেডিকেল কলেজ হইতে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত এম্ বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। দেশের নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানে ইঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ইনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি-আই-ই, উপাধি প্রাপ্ত হন।

জলধর সেন—(জন্ম ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।) ইনি নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুদিন যাবৎ সন্ন্যাসীর বেশে বহুস্থানে ভ্রমণ করেন। ইঁহার রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি অতিশয় চিত্তা-কর্ষক। ইনি যথাক্রমে সাপ্তাহিক 'বসুমতী', 'হিতবাদী' ও 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত 'হিমালয়', 'পথিক', 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সেন—(জন্ম ১৮৬৬, মৃত্যু ১৯৩৯।) ঢাকা জেলার বগজুরী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে বি. এ পাশ করিয়া ইনি 'কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া' স্কুলের হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে মনোনিবেশ করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, একমাত্র এই গ্রন্থের দ্বারাই তিনি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমরতা লাভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত 'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা', 'রামায়ণী কথা', 'মুক্তাচুরি', 'জড়ভরত' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহাকে সুলেখক ও সুসাহিত্যিকরূপে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—(জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯১৩।) ইনি ডি এল্‌ রায় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এম্‌ এ পাশ করিয়া ইনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ষ্টেট্‌ স্কলারশিপ্‌ লইয়া বিলাত যান। সেখান হইতে ফিরিয়া ইনি কিছুদিন সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারের কার্য্য করেন ও পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ হন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁহার 'হাসির গান' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন বস্তু। ইঁহার রচিত নাটকগুলি এক সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইঁহার 'সাজাহান', 'মেবারপতন', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সীতা', 'সিংহলবিজয়', 'ওপারে', 'রাণাপ্রতাপ' প্রভৃতি নাটক বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরদিন সাদরে রক্ষিত হইবে। ইঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলি, গান বাঙ্গালীর জাতীয় গানের সম্মান লাভ করিয়াছে। 'ভারতবর্ষ' নামক [illegible] মাসিক [illegible] ইনি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিয়া প্রথম [illegible] হইবার পূর্বেই লোকান্তর গমন করেন।

নিখিলনাথ রায়—২৪ পরগণা জেলার পুঁড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে ইঁহার কবিতা রচনায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে ইনি ঐতিহাসিকরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহার রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৯৪।) ইনি ২৪ পরগণান্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কিছু-না-কিছু সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন, তবে সঞ্জীব ও বঙ্কিমই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয় এবং ঐ বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আরো দুইজন ছাত্রের সহিত সর্ব্বপ্রথম বি, এ, উপাধি লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' কবিতা লিখিতে অভ্যাস করেন। 'ললিতা ও মানস' ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তৎপরে ইনি গদ্য রচনায় মন দেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' নামক প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এইগুলি প্রধান :—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত ও ধর্ম্মতত্ত্ব। ইনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ও ঔপন্যাসিক বলিয়া বিবেচিত হন।

বিপিনচন্দ্র পাল—(জন্ম ১৮৫৮, মৃত্যু ১৯৩২।) শ্রীহট্ট জেলার পৈল

নামক গ্রামে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামচন্দ্র পাল পারস্থ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি রাজসরকারে কর্ম করিতেন। বিপিনচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ না করিয়াও ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন উড়িষ্যা প্রদেশে এবং কিছুদিন মান্দ্রাজ প্রদেশে হেডমাষ্টারের কার্য্য করেন। বঙ্গদেশে ফিরিয়া তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতার দ্বারা অল্পকাল মধ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি 'পরিদর্শক' নামক একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদনা করিতেন। পরে 'New India' নামক ইংরাজী পত্রের সম্পাদনার ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক ও দৈনিক কাগজে তিনি প্রায়ই ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার রচনায় উচ্চ দার্শনিক চিন্তা, মৌলিকতা, [illegible] প্রভৃতি বিবিধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ (স্বামী)—(জন্ম ১৮৬২ মৃত্যু ১৯০২।) পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বি. এ. পাশ করিয়া পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর ইঁহার নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। ইনি ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যটন করিয়া নানাস্থানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া [illegible] আকৃষ্ট করেন। ইঁহার রচিত 'জ্ঞানযোগ', 'কর্ম্মযোগ', [illegible] প্রভৃতি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮২৫ মৃত্যু ১৮৯৪) ইনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ [illegible] বিদ্যায় [illegible] ছিলেন। ভূদেব পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত [illegible] করিয়া পরে হিন্দু কলেজে [illegible] করেন এবং তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাবিভাগে [illegible] করেন। [illegible] ইনি [illegible] উন্নীত হন। ইঁহার [illegible] প্রবন্ধ [illegible]

'পারিবারিক প্রবন্ধ' বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে তিনটি অপূর্ব্ব রত্ন। তিনি দীর্ঘকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত 'এডুকেশন গেজেট' নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা করেন। সর্ব্বোপরি ভূদেব একজন আদর্শ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। পাশ্চাত্য জাতিসুলভ উচ্চ গুণাবলীতে ভূষিত হইয়াও তিনি আদর্শ হিন্দু গৃহি-রূপে সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে এবং রোগিগণের সেবার নিমিত্ত ইনি স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই দান করিয়া গিয়াছেন।

মানকুমারী বসু—ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। যে সকল মহিলা সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বিনী হইয়াছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতমা। 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' লিখিয়া ইনি কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাঞ্জল গদ্য রচনায়ও ইঁহার সুখ্যাতি আছে। ইঁহার রচিত 'শুভসাধনা' একখানি উপাদেয় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—(জন্ম ১৮৫৭, মৃত্যু ১৯২৭।) ইনি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত' লিখিয়া ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী যশঃ লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার রচিত কাব্য 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইনি ছাত্রগণের জন্য বিবিধ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'ভারতবর্ষের মানচিত্র' নামক কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কবি-শক্তির জন্য ইঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। ইনি আদর্শ রাজ্ঞী অহল্যাবাঈ এবং সাধকশ্রেষ্ঠ তুকারামের জীবনী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত—(জন্ম ১২৫০ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।) ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় ইহার শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ইনি উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইহার বিদ্যানুরাগ অতীব প্রবল ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(জন্ম ১৮৬৪, মৃত্যু ১৯১৯।) ইনি ছাত্রাবস্থায় এণ্ট্রান্স, এফ্. এ, , বি, এ, এই তিনটি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া বিজ্ঞানেব এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি রিপণ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে উহার অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। বহুদিন যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ইহার নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। নানা মাসিক পত্রিকায় ইহাব বিজ্ঞান-বিষয়ক ও অন্যান্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদে ইনি দেশের সাহিত্যসেবীদিগের স্মৃতিতে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিতেন সেগুলিতে গভীব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবন্ধগুলি তিনি পরে 'চরিতকথা' নামে প্রকাশিত করেন। তাঁহাব বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ্। ইনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়া দেশের উন্নতি কামনা কবিতেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৭৬, মৃত্যু ১৯৩৮।) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাস লিখিয়া ইনি অতুলনীয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রাণেব কথা ও বাঙ্গালী সমাজের খুঁটিনাটি ইহার উপন্যাসের প্রধান উপাদান। ইনি এরূপ অনাড়ম্বর, সরল ও ওজস্বিনী ভাষায় বাঙ্গালীর মর্ম্ম-কথা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন যে ইহার পূর্ব্বে আর কেহই এমন করিয়া তাহা কবিতে পারেন নাই। সমাজের কোন অসঙ্গতিই তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। মানুষের মনুষ্যত্বকে এত মর্য্যাদাব চক্ষে বোধ হয় আর কেহই তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। ইঁহার রচিত 'কাশীনাথ', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথনির্দ্দেশ', 'চরিত্রহীন', পরিণীতা', 'বিরাজ বৌ', পণ্ডিত মশাই', 'মেজদিদি', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'অরক্ষণীয়া', 'গৃহদাহ', 'দেনা পাওনা', 'দত্তা', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি উপন্যাস সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি সামাজিক সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইনি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে

ভাবাইয়া তুলিয়াছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী—(জন্ম ১৮৪৭, মৃত্যু ১৯১৯।) ইনি ২৪-পরগণার অন্তঃপাতী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরিণত বয়সে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। ইনি 'মেজবৌ', 'নয়নতারা', প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস এবং কয়েকখানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'আত্মজীবনী' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তক দুইখানি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। তৎকালীন বঙ্গসমাজে যে নবযুগের সূচনা হইয়াছিল তাহার ইতিহাস জানিতে হইলে, এই পুস্তক দুইখানির সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এই দুইখানি গ্রন্থদ্বারা তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়—ইনি সিবিল সার্ভিস পাশ করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশে উচ্চ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি বর্ত্তমান যুগের একজন চিন্তাশীল উদীয়মান লেখক। তাঁহার রচনায় বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গতানুগতিক ভাবধারায় গা ভাসাইয়া না দিয়া তিনি আমাদিগকে এক নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

চারুচন্দ্র দত্ত—ইনি একজন I. C. S. সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিলাভ না করিলেও ইঁহার বর্ণনা করিবার ভঙ্গী ও দক্ষতা অসাধারণ। তাঁহার "পুরানো কথা" নামক [illegible] উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে [illegible] সমাজ [illegible] ছিল, তাহা "পুরানো কথা" গ্রন্থে তাহার একটি সুন্দর [illegible] অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী—ইনি [illegible] ছিলেন। [illegible] তিনি এক নূতন [illegible] করিয়া

ষী হইয়াছেন। তিনি "বীরবল" নামক ছদ্মনামে বহুদিন পবিচিত
লেন। তাঁহার গল্প লিখিবার অসাধাবণ শক্তি ছিল। সামান্ত বিষয়কেও
প কবিবাব তাঁহার আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখা যায়। তাঁহার রচিত "নানা
া", "নানা চর্চ্চা", "পদচাবণ", "চারইয়ারী কথা", "নীল লোহিতের
ম", ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, গত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক
ন কবিয়াছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—তরুণ সাহিত্যিকগণেব মধ্যে
ন অতি অল্প বয়সে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ কবিয়াছেন। প্রেমের
হিনী ছাড়াও যে উপন্যাস রচিত হইতে পাবে এবং অতি সাধারণ
ষয়ের মধ্যেও যে অসাধারণতা আছে তাহা এই তরুণ শিল্পীই প্রথম
মাণ করিয়া দেন তাঁহাব বচিত "পথেব পাঁচালী", "আবণ্যক" প্রভৃতি
স্থব দ্বাবা।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গবাসী কলেজের
রেজীব অধ্যাপক ছিলেন। হাস্যরসাত্মক সরস রচনায় ইঁহাব বিশেষ
রদর্শিতা ছিল। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহাব প্রগাঢ়
াণ্ডিত্য ছিল। নীরস বিষয়কে সরস করিয়া লিখিতে ইঁহার সমকক্ষ কেহ
হলেন না বলিলেই হয়। তাঁহাব রচিত 'ব্যাকরণ বিভীষিকা', 'বানান সমস্যা',
কাবেব অহঙ্কার', 'অনুপ্রাসের অট্টহাস', প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়েব জলন্ত
মাণ। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'ফোয়ারা', 'পাগলা ঝোরা', 'সাহাবা' ইত্যাদি
াঙ্গালা-সাহিত্যে অফুরন্ত হাস্যরসের উৎস-স্বরূপ চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।
য়েক বৎসর হইল ইনি পবলোক গমন করিয়াছেন।

—(*)—